ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬১ বর্ষ ৪০ সংখ্যা ।। ২৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৬ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১১) ৮ জুন, ২০০৯ ।। Website : www.eswastika.com

আয়লার তাণ্ডবে ত্রস্ত রাজ্য সরকার

দুর্গতদের নিয়ে নোংরা রাজনীতি

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। এখনও জ্বলজ্বল করছে। বুঝিয়ে দিয়েছে এ দলগুলির কাছে বিপর্যয় ধরার মহাসুযোগ। সে হোক, কিংবা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। মানুষের বিপদের সময়েও এঁরা রাজনীতি থেকে সরছেন না। ঝড়ের ১০ দিন পরেও পানীয় জল, ত্রিপল দুর্গতদের কাছে পৌঁছায়নি। কিন্তু মমতা-বুদ্ধদেব দু'জনের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে বন্যা দুর্গতদের কাছে যাওয়া নিয়ে। স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের দেখে দুর্গতরা বিক্ষোভ দেখিয়েছে। খাবার, জল, মাথার ছাদ না থাকলে এরা আর কিই বা করবে? তাতেও রাজনীতি বন্ধ হচ্ছে না। লোকসভার ভোটে ভরাডুবির পর মুখ্যমন্ত্রী যখন এই বিপর্যয়কে খড়কুটোর মতো আঁকড়ে ধরতে চাইছেন তখন মমতাও দেখছেন, রাজ্যের মানুষকে সরকারের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলার মোক্ষম সুযোগ এটি। তাই শপথ নিয়েই পাঁচ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দপ্তরে বসার আগে ছুটে এসেছেন ঝড় কবলিত এলাকায়। মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলি ক্যামেরার সামনে বস্তা বোঝাই মাটি নিয়ে সুন্দরবনে বাঁধ মেরামতির ছবি তুলিয়েছেন। মমতা আবার রেল নিয়ে ছুটে গিয়েছেন নামখানায়। রেলের নিরাপত্তা-কর্মীদের কলকাতা শহরে গাছ সরাতে পথে নামিয়েছেন। কেন্দ্রের উপর চাপ দিতে রাজ্য ইতিমধ্যেই ১০০০ কোটি টাকার দাবি জানিয়েছে। মমতা বলেছেন, সিপিএমের নেতাদের বড়লোক করার জন্য তিনি টাকা দেবেন না। টাকা দিতে হলে তা দেওয়া হবে সরাসরি পঞ্চায়েতে। এক বিচিত্র প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। অথচ এন ডি এ জমানায় লালকৃষ্ণ আদবানী দেশজুড়ে বিপর্যয় মোকাবিলার পরিকল্পনা করেছিলেন। সেই পরিকল্পনা আজ রূপায়িত হলে মমতা-বুদ্ধদেবকে মোরগ লড়াই লড়তে হত না। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সামনে এটাই এখন বড় প্রশ্ন।

গূঢ়পুরুষ ।। একটা কথা এখন স্পষ্ট যে বামফ্রন্ট সরকারের প্রশাসনিক কর্মক্ষমতা বলতে আর কিছুই নেই। এই স্পষ্ট কথাটি ভালভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছে 'আয়লা' ঘূর্ণিঝড়। এই ঘূর্ণিঝড় যে গাঙ্গেয় উপত্যকার জেলাগুলিসহ কলকাতায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঘটাতে চলেছে সাতদিন আগেই তার আগাম সতর্কবার্তা কেন্দ্রীয় আবহ দপ্তর মহাকরণে জানিয়েছিল। প্রতিদিন ঝড়ের গতি-প্রকৃতি নিয়ে লাগাতার সতর্কবার্তা রাজ্যের শিল্পবন্ধু মুখ্যমন্ত্রী পেয়েছিলেন। কিন্তু কাজের কাজ তিনি কিছুই করেননি। আমাদের রাজ্যের ইন্‌টেলেকচুয়াল মুখ্যমন্ত্রী যেটি করেছিলেন তা হল ঘটা করে ডিসাস্টার ম্যানেজমেন্ট নিয়ে তিনটি মিটিং। শেষ বৈঠকটি মহাকরণে হয় শুক্রবার ২২ মে। আয়লা আঘাত হানে তার ঠিক তিনদিন পর সোমবার ২৫ মে। বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপন্ন মানুষদের দ্রুত উদ্ধার করে ত্রাণ শিবিরে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু সেই আসল কাজটি যে বুদ্ধবাবুর প্রশাসন করতে পারেনি সে অভিজ্ঞতা রাজ্যবাসীর হয়েছে। খোদ কলকাতার বহু এলাকা টানা চার-পাঁচদিন বিদ্যুৎ ও পানীয় জল পায়নি।

প্রশ্নটা ঠিক এখানেই। প্রতিটি বৈঠকেই মুখ্যসচিবসহ মহাকরণের ডিসাস্টার ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন দপ্তরের সচিবরা সকলেই উপস্থিত ছিলেন। কলকাতা পুরসভা, সি ই এস সি এবং বিদ্যুৎ পর্ষদের কর্তাব্যক্তিরা ছিলেন। সর্বশেষ বৈঠকের পর রাজ্যের মুখ্যসচিব অশোকমোহন চক্রবর্তী মহাকরণে সাংবাদিকদের বলেছিলেন, 'আপৎকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য যাতে তাড়াতাড়ি ঝাঁপিয়ে পড়া যায় তার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতেই এই বৈঠক ডাকা হয়েছিল। ঘূর্ণিঝড়ে বিপর্যয়ের পর ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছতে বিলম্ব না হয় তা এই বৈঠকে খতিয়ে দেখা হয়। যে জেলাগুলি আয়লা ঘূর্ণিঝড়ের পথে পড়ছে সেখানে ত্রাণ সামগ্রী ও ওষুধপত্র পর্যাপ্ত মজুত আছে কিনা তা মনিটর করে দেখা হয়। আমরা জানলাম সব কিছুই ঠিকঠাক আছে। কিন্তু আয়লা আঘাত হানার পর দেখা গেল প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে অপ্রস্তুত। কোনও কিছুই ঠিক নেই। সেই পুরানো চিত্র। উদ্ধার কাজে বিলম্ব। ত্রাণ পৌঁছল না। জলবন্দি বিপন্ন মানুষদের নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দেওয়া গেল না।

তাই মুখ্যমন্ত্রী এবং মুখ্যসচিবকে এবার কৈফিয়ৎ দিতে হবে কেন প্রশাসন ব্যর্থ হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ১ হাজার কোটি টাকা রাজ্যের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মোকাবিলায় চেয়েছেন। এই অপদার্থ রাজ্য সরকারকে একটি টাকাও

(এরপর ৪ পাতায়)

আশ্রয়ের খোঁজে উলফা কমাণ্ডার চীনে

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। কয়েকদিন আগেই ভারতের নৌ-বাহিনীর প্রধান সুরেশ মেহেতা জাতীয় সুরক্ষার প্রশ্নে চীনকে পাকিস্তানের চেয়েও বিপজ্জনক রাষ্ট্র বলে অভিহিত করেছিলেন। তাঁর সেই মূল্যায়নের সত্যতা ইতিমধ্যেই টের পেতে শুরু করেছে দেশের গোয়েন্দা দপ্তর ও কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়া এক নোটে দেশের গোয়েন্দাবাহিনী জানিয়েছে, বহু বছর বাংলাদেশে লুকিয়ে থাকা উলফা কমান্ডার পরেশ বড়ুয়ার নতুন আশ্রয়দাতার নাম হল চীন। প্রসঙ্গত বলে নেওয়া দরকার, উলফা বা ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অব অসম হল অসমের একটি জঙ্গি সংগঠন যারা দাবি করছে ভারত থেকে স্বতন্ত্র অসম রাষ্ট্রের। এই সংগঠনের কমান্ডার ইন্ চীফ্ পরেশ বড়ুয়ার বহুদিন নিশ্চিন্ত আশ্রয়স্থল ছিল খালেদা জিয়ার বাংলাদেশ।

অবস্থার পরিবর্তন হয় গত বছরের ডিসেম্বরে দীর্ঘ সাত বছর বাদে আওয়ামী লিগের ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের পরে। নতুন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একের পর এক সন্ত্রাসবিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে থাকেন। মাত্র কিছুদিন আগেই সে দেশের জাতীয় নিরাপত্তা পর্ষদের দুই মহানির্দেশক মেজর জেনারেল (অবসর প্রাপ্ত) রেজাকুল হায়দার চৌধুরী এবং ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবসর প্রাপ্ত) আব্দুর রহিমকে গ্রেপ্তার করে বাংলাদেশের সি আই ডি। তাঁদের বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ, ২০০৪ সালে চট্টগ্রাম ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিমিটেডের জেটি থেকে উদ্ধার হওয়া চীন থেকে দশ ট্রাক অস্ত্রশস্ত্র পাঠানোর ঘটনায় মূল কান্ডারি ছিলেন তাঁরা। এই অস্ত্রশস্ত্র উলফা-কে দেওয়ার জন্য পাঠানো হয়েছিল। আসলে খালেদা জিয়ার সরকার বরাবরই

পরেশ বড়ুয়ার নতুন আশ্রয়দাতার নাম হল চীন।.. তিনি তিনি ইতিপূর্বে ব্যাঙ্কক ও পাকিস্তান ভ্রমণ করেছেন কিন্তু তাঁর চীন ভ্রমণ এই প্রথম।

ভারতবিরোধী সন্ত্রাসে মদত যুগিয়েছে। ভারত-বিরোধী জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি বাংলাদেশকে সেই সন্ত্রাসবাদীদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত করে তুলেছিল। এমনকী, ওই বছরেই অর্থাৎ ২০০৪ সালের ২৬ এপ্রিল ভারতের ত্রিপুরা বর্ডারের কাছে অস্ত্র-শস্ত্র সমেত একটি বাস আটক করা হয়। জানা যায় তৎকালীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ভাই ও সে দেশের সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর সৈয়দ ইসকান্দারের পরামর্শেই তা ত্রিপুরা দিয়ে ভারত সীমান্তে অনুপ্রবেশ করতে চেয়েছিল। পাকিস্তানের গুপ্তচর বাহিনী আই এস আই-এর সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ আঁতাত ছিল ইসকান্দারের।

গ্রেপ্তার হওয়া দুই সেনা অফিসারের কাছ থেকে জানা গেছে নতুন কিছু অস্ত্র-শস্ত্র আমদানির উদ্দেশ্যে চীনে রওনা হয়েছে বড়ুয়া। তাদের বক্তব্য অনুযায়ী, বড়ুয়াকে তাঁরা চিনতেন এবং সেটা সম্ভব হয়েছিল আরেক উচ্চপদস্থ জাতীয় নিরাপত্তা পর্ষদের আধিকারিক উইং কমাণ্ডর সাহাবুদ্দিন আহমেদের সৌজন্যে। প্রসঙ্গত, সাহাবুদ্দিনকে বাংলাদেশের সি আই ডি পূর্বেই গ্রেপ্তার করেছিল। ওঁরা সি আই ডিকে যা বলেছেন তা হল, অস্ত্রশস্ত্র আসার পূর্বে মেজর জেনারেল চৌধুরীর বাড়িতে চৌধুরী নিজে ছাড়াও সেখানে মুখোমুখি হয়েছিলেন রহিম, সাহাবুদ্দিন সহ অন্যান্য ষড়যন্ত্রীরা। তাঁদের আলোচ্য বিষয় ছিল কিভাবে ভারত সীমান্তে চোরা পথে অস্ত্রশস্ত্র পাঠানো যায়। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পরেশ বড়ুয়াও। সাহাবুদ্দিন সেখানে বড়ুয়াকে অনুরোধ করেন, তিনি যেন কম্বাইনড মিলিটারি হাসপাতাল পরিদর্শনে মেঃ জেঃ চৌধুরীর সঙ্গী হন। চীনের সঙ্গে যোগাযোগ করে বড়ুয়াকে সেখানে যাতায়াতের যাবতীয় পথ সুগম করে দেন বলে তাঁরা নিজেরাই স্বীকার করে নিয়েছেন।

ভারতের গোয়েন্দাবাহিনী জানিয়েছে, বড়ুয়ার চীনের সঙ্গে মোবাইল ফোন ও সেই সঙ্গে স্যাটেলাইট ফোনের যাবতীয় সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে তারা সফল হয়েছেন। সেই সাথে সে দেশে বড়ুয়ার নির্দিষ্ট অবস্থান খুঁজে পেতে তারা মরিয়া। গোয়েন্দাবাহিনী মনে

(এরপর ৪ পাতায়)

আন্তর্জাতিক ড্রাগ ম্যাপে মুর্শিদাবাদ

নবকুমার ভট্টাচার্য ।। আশির দশকে উত্তরপ্রদেশের বারাবাঁকি থেকে মাদক আসত পশ্চিমবঙ্গে। সেইসঙ্গে মাদক আসত নেপাল সীমান্ত পেরিয়ে। কিন্তু এখন আর উত্তরপ্রদেশ আর নেপালের উপর নির্ভর করে থাকতে হয় না মাদক ব্যবসায়ীদের। মাদক উৎপাদন হচ্ছে এখন খোদ পশ্চিমবঙ্গেই। ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর মুর্শিদাবাদ জেলার প্রত্যন্ত বহু গ্রামে এখন ধান-পাটের সঙ্গে চাষ হয় গাঁজার। পোস্ত চাষ এক ধরনের সমৃদ্ধি এনেছে মুর্শিদাবাদের ঘরে ঘরে। পোস্ত থেকে গাঁজা — এলাকার কিছু ধনী কৃষককে বাদ দিলে ওই চাষে নেমেছে প্রায় সকলেই। একাজে সহায়তা করছে বাংলাদেশি মাদক কারবারীরা। শিলিগুড়ির কিছু মাদক ব্যবসায়ীও ইদানীং এই কাজে হাত পাকাচ্ছেন। বাংলাদেশি মাফিয়ারা এই অঞ্চলে বারবার আসেন না। ফসল লাগানোর আগে সীমান্ত পেরিয়ে গ্রামের চাষির সঙ্গে কথা বলে তারা জমি লিজ নিয়ে নেন। পোস্ত চাষের জন্য বীজ লাগানোর খরচ থেকে ট্রাক্টর, সেচের জলের খরচ সব তারা দেন। ফল পেকে গেলে নির্দিষ্ট সময়ে এসে এরা লোক দিয়ে পোস্ত ফলের থেকে ব্রাউন সুগার, হেরোইন এবং আফিং উৎপাদনের জন্য রস বের করে নিয়ে যায়। বিষয়টি সকলের কাছে গোপন করার কৌশল হিসেবে রাই শস্যের মাঝে মাঝে লাগানো হয় পোস্ত বীজ। রবিশস্য ফলনের সময় আফিং চাষ হয় এবং পোস্ত চাষ হয় কার্তিক-

অগ্রহায়ণ মাসে। রেজিনগর, লালগোলা, বেলডাঙ্গা, ভগবানগোলা, নওদা ইত্যাদি অঞ্চলে এই চাষ ব্যাপকভাবে হচ্ছে। পুরো ব্যবসাটা হয় মুখের কথাতে।

চাষীদের মতে, এক বিঘায় যত পোস্ত উৎপাদন হয় তা থেকে আফিম ও অন্যান্য মাদক তৈরি করলে দাম হয় প্রায় ৫০ হাজার টাকা। পোস্তর রস থেকে আফিম তৈরি হয়।

(এরপর ৪ পাতায়)

আয়ের সুবর্ণ সুযোগ!!!
SBI Life Insurance প্রমোট করছে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক State Bank of India, SBI Life সীমিত সংখ্যক Insurance Advisor নিয়োগ করছে।
যে কোনও পুরুষ / মহিলা HS পাশ / পিয়ারলেস, GTFS, Alchemist, Rose Valley ও সাহারা Agent / VRS নেওয়া Govt. Employee / Postal Agent / অবসরপ্রাপ্ত Bank Employee-রা আবেদন করতে পারেন।
যারা সফল কেরিয়ার করতে ইচ্ছুক তারা Interview-র জন্য যোগাযোগ করুন –
Mr. Ajoy Kumar Saha Mobile : 9830952221
SBI Life
INSURANCE
With Us, Your's Sure

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের ফলে ভোটের ছায়া

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। নজিরবিহীনভাবে পাশের হারে রেকর্ড গড়ে প্রকাশিত হল মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল। সামগ্রিকভাবে মাধ্যমিকে এবার পাশের হার ৮১.৭৪ শতাংশ। যা গতবারের (৭২.৪৬ শতাংশ) থেকে ৯ শতাংশেরও বেশি। প্রকৃতপক্ষে শতাংশের হিসেবে আটের ঘরে প্রবেশ করা তো দূরস্থান, কোনওবার মাধ্যমিকে পাশের হার ৭৫ শতাংশের গন্ডী টপকায়নি। মাধ্যমিকের তুলনায় উচ্চমাধ্যমিক এমনিতেই কঠিন। কয়েক বছর আগে তো তা কঠিনতম ছিল বলা যায়। সেই উচ্চমাধ্যমিক গতবারই পাশের হারে শতাংশের হিসেবে আটের ঘরে পৌঁছে এক অর্থে অনন্য কীর্তি স্থাপন করেছিল। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের গড়া সেই কীর্তি এবার তারা ভেঙ্গে দিয়েছে নিজেরাই। গতবারের থেকে প্রায় দেড় শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়ায় এবার উচ্চমাধ্যমিকে পাশের হার ৮২.০৮ শতাংশ।

এই পরীক্ষার ফলে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ উভয়েই খুশি। এঁদের খুশি হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। তবে এঁরা ছাড়াও তৃতীয় আরেকটি পক্ষ এই ফলে বেশ আনন্দিত হচ্ছে। তাঁরা হলেন রাজ্য সরকার তথা সরকারের শিক্ষা দপ্তর। রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা, উচ্চশিক্ষার মতোই মধ্যশিক্ষার হালও শোচনীয়। সেই অবস্থাকে ধামাচাপা দেবার জন্য বাম সরকারের এ এক অকল্পনীয় প্রয়াস। এমনটাই মনে করছেন অর্থনীতিবিদ অভিরূপ সরকার। আসলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষামহল, এই দুর্দান্ত ফলাফলকে ছাপিয়ে এর পেছনে অন্য কোনও উদ্দেশ্যের অনুসন্ধান করছেন সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। তাঁদের বক্তব্য, রাজ্যের গ্রামীণ এলাকা তো বটেই, শহুরে এলাকাতেও সরকারি স্কুলগুলিতে পঠন-পাঠনের উপযুক্ত পরিকাঠামো নেই। সেখানে এরকম ভাল ফল হচ্ছে কি করে? তবে কি লেখাপড়ার মানের অবমূল্যায়ন ঘটেছে? শিক্ষাবিদ্‌দের আশঙ্কা, আসলে পরীক্ষায় পাশ করিয়ে দেবার খেলা চলছে। তাঁদের আশঙ্কায় ইন্ধন যুগিয়েছেন উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সচিব স্বপন সরকার। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন এত ভাল ফল হতে থাকলে ভবিষ্যতে হয়ত ফেল জিনিসটাই উঠে যাবে পরীক্ষা থেকে! তাঁর এহেন মন্তব্য ও একদা পাশ ফেল প্রথা তুলে দেওয়া বামফ্রন্ট সরকারের অতীতের ট্র্যাক-রেকর্ড সেইসব শিক্ষাবিদ্‌দের আশঙ্কাকে সূর্যালোকের ন্যায় সত্যি বলে প্রমাণিত করতেই পারে। সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক মহল এর পরিপ্রেক্ষিতে মনে করছে সাম্প্রতিক লোকসভা নির্বাচনে ল্যাজে-গোবরে হওয়া বাম সরকার, ২০১১-র দিকে লক্ষ্য রেখে যে জনমোহিনী নীতি নিতে চলেছে, তারই আওতাভুক্ত হয়েছে ছাত্রজীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা দুটি।

এই ফল প্রকাশের পরেই যে সমস্যাটি সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে তা হল ভর্তি সমস্যা। এবার মাধ্যমিকে পাশ করেছেন ৬ লক্ষ ৮৯ হাজার ৫১ জন। গতবারের থেকে যা ১ লক্ষ ৫৬ হাজার বেশি। অথচ গত এক বছরে নতুন করে কোনও স্কুল উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পঠন-পাঠনের অনুমোদন পায়নি। আর যেগুলিতে এই ধরনের পঠন-পাঠন হয় তাদের অবস্থাও তথৈবচ। এখন দায়ে পড়ে রাজ্য সরকার যদি পরিকাঠামোবিহীন কিছু স্কুলকে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করার চেষ্টা করে তবে পরিস্থিতি যে আরও ঘোরালো হবে তাতে কোনও সন্দেহই নেই। সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা হচ্ছে রাজ্যের কলেজগুলিতে। সর্বসাকুল্যে রাজ্যের জেনারেল ডিগ্রী কলেজগুলিতে আসন সংখ্যা দেড় লক্ষের কাছাকাছি।

উচ্চমাধ্যমিকে এবার পাশ করেছেন ৩ লক্ষ ৭৭ হাজার ৪০১ জন। এর সঙ্গে সি বি এস ই, আই এস সি পরীক্ষার্থীদেরও যুক্ত করুন। পড়াশুনো ছেড়ে দেওয়া এবং অন্য কোনও পেশাদারী কোর্সে ভর্তি হওয়ার সংখ্যাটা ছেড়ে দিলেও বাকি বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীদের সবাইকে ভর্তি নেওয়ার ক্ষমতা রাজ্যের কলেজগুলির নেই। গতবারও ৩ লক্ষ ৪১ হাজার পাশ করায় এই বিপত্তি হয়েছিল।

এবার তো এই সমস্যার জল যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা ভেবে কূল-কিনারা পাচ্ছেন না ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকরা।

আবার এবছরই মাধ্যমিকের ফল প্রকাশে প্রথম গ্রেডেশন পদ্ধতি চালু হল। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ব্যাখ্যা, এই পদ্ধতিতে পরীক্ষার্থীকে প্রতিটি বিষয়ে অন্তত২৫ করে পেতেই হবে। অর্থাৎ সর্বসাকুল্যে কোনও ছাত্র বা ছাত্রী ২০০ পেলে পাশ করে যাবেন। আগেকার নিয়মে পরীক্ষার্থীদের সর্বমোট অন্তত ২৭২ নম্বর পেতেই হোত। পরীক্ষার ফলে ভোটের হাওয়ার অভিযোগ তা হলে সত্যি!

এই সময়

টপ কোম্পানী

বিশ্বের কাছেও ভারতীয় কোম্পানী-গুলির গুরুত্ব ক্রমশ বাড়ছে। বিশ্বের টপ ৫০টি কোম্পানীর মধ্যে ভারতের ৫টি কোম্পানীও, নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে, বিশ্বাসযোগ্যতার নিরীখে। এছাড়াও, বিশ্বের সর্বাধিক ৬০০টি কোম্পানীর মধ্যে ২২টি কোম্পানী রয়েছে ভারতের। বৃহৎ পাঁচটি কোম্পানীর মধ্যে রয়েছে টাটা, এস বি আই, মারুতি-সুজুকির মতো কোম্পানী। বৃটেনের এক ম্যানেজমেন্ট ফার্মের রিপোর্টে এই তথ্য উঠে এসেছে।

একই পথে

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের ঘটনায় বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় অংশ বাম বিরোধী। টালিগঞ্জের নবীন কলাকুশলীরাও এখন এই পথেরই যাত্রী হচ্ছেন। সম্প্রতি আয়লা-কান্ডে এমনই ইঙ্গিত পাওয়া গেছে টালিঘরে। মেয়র বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের আয়লা মোকাবিলার ব্যর্থতার কঠোর সমালোচনা করেছেন টালিগঞ্জের নতুন শিল্পীরা। কাঞ্চন মল্লিক, পরমব্রত-র মতো অভিনেতারা প্রকাশ্যে বিকাশবাবুর বিরুদ্ধে ক্ষোভ জাহির করেন। অনেকে বিকাশ ভট্টাচার্যকে অপদার্থ বলতেও পিছপা হননি।

সুগন্ধী

এক সময় ছিল ২৫ পয়সার পোস্ট কার্ড। তারপর এল মোবাইলে এস এম এস। এখন চলছে ই-মেলের চল। তবে এখানেই থেমে থাকছে না ইন্টারনেট। এবার খুব শীঘ্রই মেল করা যাবে সুগন্ধিও। বৃটেনের 'টেলিবেস্ট' নামে এক নেট কোম্পানী এমনই প্রক্রিয়া চালুর চেষ্টা চালাচ্ছে। টেলিবেস্ট এমন এক এয়ার ফ্রেশনার আবিষ্কার করেছে, যেটি কম্পিউটারের সঙ্গে সহজেই যুক্ত করা যাবে। তাতেই পাঠানো যাবে শুধু মেল নয়, সুগন্ধী ই-মেলও।

হিন্দ শক্তি

সেনাদের মধ্যে শারীরিক শক্তির বিকাশে প্রাচীন পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছিল ভারতীয় সেনাবাহিনী। টানা ৭২ ঘন্টা ধরে প্রাচীন রীতিতে ব্যায়ামের অভ্যাস করালেন সেনাবাহিনীর উচ্চ আধিকারিকেরা। 'হিন্দ শক্তি' নামে এই কার্যক্রমের মূল বিষয়ই ছিল ভারতের প্রাচীন শরীর চর্চার পদ্ধতি। সম্প্রতি এমনই এক কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়েছিল ভারতীয় মিলিটারিতে। সেনা প্রধান দীপক কাপুরের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হয় 'হিন্দ শক্তি'র অনুশীলন।

বলার জন্য বলা

আবারও মুখ খুললেন বিমান বসু। দলের ভরাডুবির পর, বিশেষজ্ঞদের ধারণা ছিল, তিনি বুঝে-সুঝে মুখ খুলবেন। কিন্তু তা হয়নি। আয়লা বিধবস্তদের ত্রাণে বিরোধীদের সাহায্যকে কটাক্ষ করলেন ফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু। বিরোধীরা টাকা দিয়ে ভোট কিনতেই ত্রাণের ব্যবস্থা করছেন বলে মন্তব্য করেন প্রবীণ এই নেতা। শাসকদল ও সরকার যে ত্রাণে ব্যর্থ, তা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের রিপোর্টে আগেই ধরা পড়েছে। ফলে বিমানবাবুর মন্তব্যে খুশী নন বিপর্যস্ত মানুষেরাও। অনেকের মতে, তাঁকে কিছু বলতে হয়, তাই বলেন।

বাবুর ক্ষোভ

ভারতে পুলিশি ব্যবস্থার চিত্র বরাবরই হাতাশাজনক। মানুষের বন্ধু হিসাবে পুলিশ কোনও দিনই বিকল্প হয়ে উঠতে পারেনি। আজও না। খোদ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনও খুশি নয় পুলিশের ভূমিকায়। ২৭ মে এক বিবৃতিতে মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন বিচারপতি এস রাজেন্দ্র বাবু পুলিশের ভূমিকার কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, পুলিশ জনগণের সেবায় নিযুক্ত এই সত্য ভুলে যাচ্ছে। সুপ্রীম কোর্ট পুলিশি ব্যবস্থার যে সংস্করণের কথা বলেছিলেন, কোনও রাজ্যেই তা হয়নি বলেও শ্রীবাবু ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

ব্যাক টু হোম

দল ও নিজের ভরাডুবির পর লালু এখন তৃণমূলস্তরে শক্তি বৃদ্ধিতে মন দিয়েছেন। পরাজয়ের পরই ইউ পি এ ছাড়া ভুল হয়েছিল বলে কাঁদুনি গান তিনি। আর জে ডি-র এহেন পরাজয়ের পর, অবশেষে সব আশা ছেড়ে তিনি বিহারের দিকে মন দিয়েছেন। মাঝে মধ্যেই বিভিন্ন র‍্যালিতে অংশ নিচ্ছেন। সঙ্গে রয়েছে বৈঠক ও দলীয় কর্মীদের সঙ্গে সভা-র মতো ঘটনাও। লালুর এই 'ব্যাক টু হোম' নীতি দলের শক্তি বৃদ্ধিরই উদ্দেশে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

কনিষ্ঠতম

২০০৮-এর মে মাসে কনিষ্ঠতম সাংসদ হিসাবে রেকর্ড করেছিলেন তিনি। আগাথা সাংমা। ২৮ মে, ২০০৯-এ ২৯ বছরে মন্ত্রী হয়ে আবার একটা রেকর্ড। ভারতের প্রথম ক্ষুদে মন্ত্রী। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষের জন্যই তিনি কাজ করবেন বলে সাংমা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি দুঃখের সঙ্গে বলেন, একটা সময় সংসদে আমার কথা শোনার জন্য কেবল উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাংসদরাই হাজির থাকতেন। ফলে লড়াইটা এখন আরও শক্ত। উত্তর পূর্বাঞ্চলের মানুষও সাংমাকে মন্ত্রী হিসাবে পেয়ে খুশী। তারাও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নতিতে আশাবাদী।

ক্ষীর ভবানী মেলা

কাশ্মীরে প্রতি বছরের মতো এবছরও শুরু হয়েছে ক্ষীর ভবানী মেলা। চলবে পনের দিন ধরে। এই মেলার পিছনে একটি প্রচলিত গল্প রয়েছে যে, এক কাশ্মীরী পণ্ডিত দিবাস্বপ্নে পুজো করার বার্তা পান। ওই বার্তা পেয়ে পণ্ডিতজী পুজোর প্রথা চালু করেন তুল্লামুল্লা গ্রামে। তারপর থেকেই এই মেলা চলতে থাকে, বংশ পরম্পরায়। বহু বছর ধরে এই পুজো হয়ে আসছে। মেলা উপলক্ষ্যে কয়েক হাজার কাশ্মীরী পণ্ডিত ও ভক্তরা এখানে উপস্থিত হয়েছেন।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

বিজেপি ও তাহার আদর্শ

লোকসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর হইতে হিন্দুত্ববাদী বুদ্ধি জীবী মহল নানান প্রশ্নে সরগরম। কেহ কেহ এই নির্বাচনকে জনগণের এক অভূতপূর্ব জাতীয় রায় হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। কারণ তাহাদের মতে, এই নির্বাচন নাকি জাতীয় রাজনীতিতে আনয়ন করিয়াছেন দ্বি-দলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার শুভ সূচনা। সেই ব্যবস্থায় থাকিবে শুধু দুইটি মেরু। এক মেরুতে থাকিবে বিজেপি, আর এক মেরুতে থাকিবে কংগ্রেস। প্রতি নির্বাচনে কেবল একটি মেরুই স্বাধীন ও মুক্ত মনে জনগণের রায় লইয়া সরকার গঠন ও শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারিবে। নিঃসন্দেহে একটি স্বর্গীয় চিন্তা। ভাবিতে বেশ লাগে। কিন্তু ইহা ভারতবর্ষ। একবার একটি দল একক চূড়ান্ত সংখ্যাধিক্য লইয়া ক্ষমতায় আসিতে পারিলে সমস্ত লিখিত বা উচ্চারিত আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়া ক্ষমতাকে নিষ্কন্টক করিতে কালক্ষেপ করিবে না। আমাদের সংসদীয় গণতন্ত্রে সংখ্যালঘু সরকারও ক্ষমতা ধরিয়া রাখিতে কতদূর যাইতে পারে, তাহার প্রমাণ তো শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর জরুরি অবস্থা জারির মধ্যেই পাইয়াছি। দেখা যাইতেছে, আদর্শ ক্ষমতা দখল করিবার একটি মার্গ মাত্র, কাজ হাসিল হইলে আদর্শ ছুঁড়িয়া ফেলিতে কতক্ষণ!

এই আদর্শ লইয়াই প্রশ্ন উঠিয়াছে। একসময় ছিল যখন মানুষ বিজেপিকে একটি আদর্শনিষ্ঠ রাজনৈতিক দল বলিয়াই মনে করিত। এই আদর্শনিষ্ঠ রাজনৈতিক দলের প্রতি আকৃষ্ট মানুষেরও অভাব ছিল না যাহারা সুখে-দুঃখে এই দলীয় সংগঠনের প্রতি একনিষ্ঠ ছিল। কিন্তু একবার কেন্দ্রের ক্ষমতায় যাওয়ার জন্যই কিংবা ক্ষমতায় পুনরায় আসিবার সম্ভাবনা আছে বলিয়াই হউক, অথবা অনেক রাজ্যে ক্ষমতায় অধিষ্ঠান করিবার ফলেই হউক, কিছু সংখ্যক ব্যক্তি কিন্তু আর শুধুমাত্র আদর্শে আকৃষ্ট হইয়াই আসিতেছে না। তাহারা আজ দলের প্রতি আকৃষ্ট নানান কারণে, নানান কাজে এবং নানান লক্ষ্যে। সাময়িক লাভ বা ক্ষমতায় টিকিয়া থাকিতে দল যে এইসব ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সহিত আপোষ করে, তাহার নজির অপ্রতুল নহে। আদর্শ সেখানে ম্লান হইয়া যায়।

অনেকেই আবার বিজেপিকে একটি কংগ্রেস বিরোধী মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করিতে আসিতেছে। আবার কেহ কেহ বা আসিতেছে অন্যান্য দলের বিরুদ্ধে বিজেপিকে ব্যবহার করিতে। অনেক সুবিধা, অনেক প্রশাসনিক সুযোগের অপব্যবহারই তাহাদের লক্ষ্য। বিশেষত, কেন্দ্রে ক্ষমতায় না থাকিলেও দেশের বেশ কয়েকটি রাজ্যে বিজেপি শাসন ক্ষমতায় রহিয়াছে।

এই সকলেরই পরিণতি হইতেছে দলের মধ্যে হুজুর-নাজিরদের উদ্ভব। এক কথায় চাটুকার পরিবৃত একদল নয়া হুজুরের আবির্ভাব। এই ধরনের মানুষ জ্যোতিষীদের ভবিষ্যৎবাণীতে বড়ই আশ্বস্ত ছিল। কিন্তু নির্বাচনী ফল প্রকাশের পর তাহারা আশাহত হইয়া পড়িয়াছে। এই শ্রেণীর মানুষের কাছে দলের অকস্মাৎ হার ততটা কিন্তু মর্মান্তিক নয়, যতটা মর্মান্তিক আদর্শনিষ্ঠ দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের কাছে।

আভাসে ইঙ্গিতে মনে হইতেছে বিজেপি দলের পতনে সমালোচনা এড়াইয়া চলিতেই যেন বেশি সচেষ্ট। তাহাদের ভয়, এই বুঝি তাহাদের ব্যক্তিগত সাজানো প্রতিষ্ঠা বা বাগান ভাঙ্গিয়া পড়িবে। তাই তৃণমূল স্তর পর্যন্ত সাংগঠনিক ত্রুটি ও দুর্বলতাগুলি খুঁটাইয়া দেখিতে তাহাদের অনীহা। কিন্তু আদর্শের প্রশ্নগুলি চাপা দেওয়া দলের পক্ষে সহজে সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। কারণ ইহাই দলের প্রাণের প্রশ্ন। কেননা, এই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতেই জনতা পার্টি হইতে ভারতীয় জনতা পার্টির জন্ম।

কেহ কেহ বলিতেছেন, দেশে নাকি দ্বি-দলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সূচনা হইয়াছে। এই কথা বলিবার অর্থ পরিষ্কার নহে। কারণ কি এই যে কংগ্রেস দুই শত ছয়টি আসন পাইয়াছে। আর বিজেপি পাইয়াছে ১১৬টি আসন। তাহা হইলে ১৯৯৯ সালে যখন বিজেপি প্রায় দুই শতটি আসন লইয়াছিল, তখন এই কথা ওঠে নাই কেন? এইবারে লালু-মুলায়ম-রামবিলাসরা বেশি আসন লাভ করে নাই বলিয়াই কি? এবারের নির্বাচনে বিজেপি এবং কংগ্রেস দুই দল মিলাইয়া মোট ভোট পাইয়াছে ৪৮ শতাংশের কাছাকাছি। অর্থাৎ অন্যান্য আঞ্চ লিক দলগুলি সম্মিলিতভাবে ভোট পাইয়াছে ৫২ শতাংশের মতো। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, আঞ্চ লিক দলগুলির পাল্লাই এখনও ভারী। তাহা হইলে দেশে এমন দুই মেরুকেন্দ্রিক দলীয় ব্যবস্থা চালু হইতেছে একথা বলিয়া যাহারা সোচ্চার তাহাদের দাবির যৌক্তিকতা লইয়া প্রশ্ন থাকিয়াই যায়। এমন রাজ্য তো আছে যেখানে কংগ্রেস বা বিজেপি এককভাবে ক্ষমতায় যাওয়ার মতো অবস্থায় নেই। এই রাজ্যগুলি হইল তামিলনাড়ু, ওড়িশা, পশ্চি মবঙ্গ, ত্রিপুরা, কেরল প্রভৃতি। তাহা হইলে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার উদ্ভব হইল কেমন করিয়া?

শতকরা ভোটের হিসাব ধরিলে তো আরও মজার ব্যাপার দেখা যাইবে। এমন বহু রাজ্য আছে, যেখানে কংগ্রেসের ভোট কমিয়াছে, কিন্তু আসন বাড়িয়াছে। আবার ভোট বাড়িয়াছে অথচ আসন কমিয়াছে। বিজেপির ক্ষেত্রেও এই একই চিত্র আমরা দেখিতে পাইতেছি। বিচিত্র বিচিত্র ঘটনা ভারতীয় নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য। যেমন সব দল সব রাজ্যে একই ফল করে নাই। এই তো লোকসভা নির্বাচনের পরে পরেই উত্তরাখণ্ডে যে উপনির্বাচন হইয়াছে, তাহাতে তো বিজেপি জয়লাভ করিয়াছে। ত্রিপুরাতেও সি পি এম গো-হারা হারিয়াছে। মাত্র কিছুদিন আগেও তো এই দুইটি দলই নিজ নিজ রাজ্যে একেবারে বিপরীত ফল করিয়াছিল। উত্তরাখণ্ডে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি একটি আসনও লাভ করিতে পারে নাই, যদিও সেই রাজ্যে শাসক দল বিজেপিই। অন্যদিকে ত্রিপুরায় লোকসভায় রাজ্যের দুইটি আসনে শাসক সি পি এম জিতিবার পরই উপনির্বাচনে হারিয়াছে। তাই এই নির্বাচনী ফলকে ঋষি অরবিন্দের ভাষায় 'খণ্ডিত' বলাই উচিত।

লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি'র বিপর্যয়ের কারণ

এন সি দে

অবশেষে পঞ্চদশ লোকসভা নির্বাচনী প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। ফলাফল প্রকাশিত হয়ে গেছে। এটাও পরিষ্কার হয়ে গেছে যে সেই পরিচিতি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠিত, দালাল পুঁজিপতিদের স্বার্থবহনকারী এবং একজন বিদেশিনী পরিচালিত কংগ্রেস দলটিই পুনরায় ক্ষমতা দখল করেছে। স্বাভাবিক ভাবেই কংগ্রেস শিবির আজ উল্লসিত। ঝাঁকের কইরা আবার ঝাঁকে ফিরতে শুরু করেছে। যে কংগ্রেস সি পি এমের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে মমতাকে আমরণ অনশনের ফাঁদে ফেলে মারতে চেয়েছিল, সেই মমতা আবার কংগ্রেসের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। লালু-মুলায়ম-রামবিলাস ও মায়াবতীরা কংগ্রেসের চাটুকারিতায় একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছে। বামপন্থীরা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। এতদিন তারা ছিল ভারতীয় রাজনৈতিক ক্ষমতার স্বঘোষিত নির্ণায়ক শক্তি। আজ তারা ইতিহাসের নিয়মে অপাংক্তেয় ও ক্ষমতার অলিন্দে উপেক্ষিত।

অপরদিকে বিজেপি'র শিবিরে যেন নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ। তারা ভাবতেই পারেনি ভারতবর্ষের সরল মানুষ মনে মনে ঠিক করেই ফেলেছিল যে আর জোটের জটিলতা নয়, চাই স্থিতিশীল একদলীয় শাসন, যারা জাতিকে দিতে পারবে এক আত্মনির্ভরশীল শক্তিশালী অর্থনীতি। ভিতরে বাইরে সন্ত্রাসবাদ মুক্ত এক সমাজ ও সংস্কৃতি। তারা সফল হয়েছে কমিউনিস্ট ও জাতপাত নির্ভর দলের হাত থেকে সরকারকে বাঁচাতে। কিন্তু সফল হয়নি প্রকৃত দলটিকে বাছতে। কেন? কারণগুলো লুকিয়ে রয়েছে বিজেপি'র অভ্যন্তরেই। সেগুলোকে খোলা মনে খুঁজে বের করে নির্মূল করার মধ্যেই বিজেপি'র ভবিষ্যত সাফল্যের চাবিকাঠি লুকিয়ে রয়েছে।

বিজেপি সাংগঠনিকভাবে এখনও সর্বভারতীয় হতে পারেনি। সারা দেশে সমস্ত প্রদেশে তার সংগঠন তো দূরের কথা, তার সামান্য প্রভাবও নেই। বিজেপি এখন কংগ্রেসের চেয়েও বেশি নেতানির্ভর দলে পরিণত হয়েছে। তা না হলে যে সমস্ত প্রদেশে একসময় বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছে সেসমস্ত প্রদেশেও গো-হারান হারতো না। তৃণমূল স্তরে শক্তপোক্ত সংগঠনই দলকে জনগণের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রাখে। তাই নীতি আদর্শকে যতক্ষণ দল আঁকড়ে থাকে, ততক্ষণ জনগণ দলকে পরিত্যাগ করে না— এটিই ভারতীয় জনগণের শাশ্বত আচার।

গত পাঁচ বছর ভারতীয় জনগণ মনমোহন সিং সরকারের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিল। কারণ, এই সরকারের আমলে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম আকাশের রেকর্ড সীমায় পৌঁছেছিল। মুদ্রাস্ফীতি রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছিল। কৃষক আত্মহত্যা যেন মরসুমী ফসল হয়ে উঠেছিল। রপ্তানী বাণিজ্যের জায়গায় বেড়েই চলেছিল আমদানি বাণিজ্য। ফলে বাণিজ্যিক ঘাটতি, আর্থিক ঘাটতি ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। প্রধানমন্ত্রী ছিলেন রাজ্যসভার থেকে মনোনীত সোনিয়ার ছায়া মাত্র। এমন কংগ্রেস সরকার ও তার প্রধানমন্ত্রীকে হটানোর জন্য জনগণ প্রস্তুতও ছিল। গত কয়েকমাস ধরে রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেসের পতন ও বিজেপি'র উত্থান থেকেই তা বোঝা যাচ্ছিল।

কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নেতিবাচক রাজনীতির পৃষ্ঠপোষক, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে ক্ষমতা দখলের কারবারি কমিউনিস্টরা ছোট ছোট ক্ষমতালোভী ভূস্বামীদের নিয়ে যে তৃতীয় ফ্রন্টের জন্ম দিয়েছিল এবং তার পাশাপাশি লালু-মুলায়ম-রামবিলাস নামক জাতপাতের কারবারিরা যে চতুর্থ ফ্রন্টের জন্ম দিয়েছিল তাতে ভারতীয় জনগণ চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। ইতিমধ্যেই কমিউনিস্টরা জাতীয় রাজনীতিতে দায়িত্বহীন ফোড়ে'র দুর্নাম অর্জন করেছিল। তার উপর ব্যাপক গণমাধ্যম ও তথ্য প্রযুক্তির যুগে পশ্চি মবঙ্গ ও কেরলের কু-কীর্তি গুলোও সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। খুব স্বাভাবিক ভাবেই জনগণ এই নেতিবাচক রাজনীতির ধারক-বাহক ও রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির মধ্য দিয়েই যাদের রাজনীতির উত্থান সেই কমিউনিস্টদের তৈরি তৃতীয় ফ্রন্ট কিংবা চতুর্থ ফ্রন্টকে ভাল

"সব কেন্দ্রেই বিজেপি তার নিজস্ব ভোটব্যাঙ্ক অটুট রাখতে পেরেছে। কোনও কোনও কেন্দ্রে পেয়েছে দেড় লাখের উপর ভোট,কোথাও বা দু-লাখ। অতএব বোঝাই যাচ্ছে বিজেপির নিজস্ব ভোটব্যাঙ্ক একটা রয়েছে। একটু সংগঠনে মন দিলে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে কয়েকটি আসন লাভ অসম্ভ ব নয়।"

চোখে দেখেনি। এদের ঠেকাতে যেখানে বিজেপির কোনও সংগঠন বা অস্তিত্ব নেই, সেখানে কংগ্রেস কিংবা তার সঙ্গীদের ব্যাপকভাবে ভোট দিয়েছে। তামিলনাড়ুতে এই ঘটনা ঘটেছে। এবারের নির্বাচনে জয়ললিতার দলের বিপুল জয়লাভের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বিপুল সংখ্যায় হেরে গেছে। করুণানিধির দল অপ্রত্যাশিতভাবে বিপুল সংখ্যক আসন লাভ করেছে। জয়ললিতার পরাজয়ের একমাত্র কারণ, তিনি কমিউনিস্টদের তৃতীয় ফ্রন্টের শরিক হয়েছিলেন। তামিলনাড়ুতে বিজেপির কোনও সংগঠন বা অস্তিত্ব না থাকায় জনগণ কংগ্রেসী জোটকেই বেছে নেয়। অন্ধ্রেও কংগ্রেসের পরাজয় নিশ্চি ত থাকা সত্ত্বেও টিডিপি কমিউনিস্টদের সঙ্গে ওঠাবসা করায় জনগণ তাদের প্রত্যাখ্যান করে কংগ্রেসকেই বেছে নেয়। ওড়িশাতেও এবার কংগ্রেসের পক্ষে বেশি ভোট পড়ায় বিজেডি লাভবান হয়েছে। কারণ, সেখানেও সেই বিজেপির সংগঠনহীনতা। দলের প্রদেশ সভাপতি শ্রীপূজারী নিজেই স্বীকার করেছেন যে, বিজেডি নির্বাচনের ঠিক আগেই জোট থেকে বেরিয়ে যাওয়ায় তাঁরা সংগঠনকে তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নিতে পারেননি। একাজ তারা ক্ষমতায় থাকাকালীন কোনও রাজ্যেই করেনি। তার প্রতিফলন দেখেছি, রাজস্থানে, দিল্লীতে, উত্তরাখণ্ড, মধ্যপ্রদেশে ইত্যাদি প্রদেশে। সংগঠনহীনতা যে কেমন বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে নিজের কর্মীদের ওপরে, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পশ্চি মবঙ্গ। বামপন্থীদের ওপর এতটাই বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিল এখানকার মানুষ যে (এমনকী বিজেপি'র সমর্থকদের একাংশও), এবার খোলাখুলি প্রচার করেছিল এই বলে— 'সি পি এমকে হঠাতে তৃণমূলকে ভোট দিন। বিজেপি যখন জিততেই পারবে না তখন বিজেপিকে ভোট দিয়ে ভোট নষ্ট করবেন না।'

এ এক অভিনব ঘটনা। একে চাপা দিলে বাড়বে। তাই এই শৃঙ্খলাহীনতাকে নির্মম ভাবে নির্মূল করতে হবে সম্মিলিতভাবে।

এসবই সংগঠনহীনতার ফল। সংগঠনহীনতা দলকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে, আর তা থেকেই আসে নানান ধরনের হতাশা। যেটা ঘটেছে এবারের নির্বাচনে। আগামী পাঁচ বছর আর শুধু টিভির পর্দায় মুখ দেখানো নয়, রোদ-বৃষ্টি-জলে নিজ নিজ কেন্দ্রে জনগণের সমস্ত অভাব অনটনের লড়াইয়ে থাকতে হবে। ৪২টি কেন্দ্রের প্রার্থীদের তাদের নিজ নিজ কেন্দ্রে এখন থেকে দায়িত্ব দেওয়া হোক। নিজ নিজ কেন্দ্রকে লালন-পালন করার দায়িত্ব নিজেদেরই পালন করতে হবে। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য নেতৃত্বের নীতি-আদর্শ কৌশলের ওপর ভিত্তি করেই।

এটা নিশ্চি ত যে মমতার সঙ্গে কংগ্রেসের এই মধুচন্দ্রিমা দীর্ঘস্থায়ী হবে না। কারণ, মমতা বামপন্থীদের চেয়েও বেশি বামপন্থী। জনমোহিনী হওয়ার প্রবণতা তার মজ্জাগত। তাছাড়া তার মূল লক্ষ্য রাজ্যের ক্ষমতা দখল। আগামী দু-বছর তাকে জনমোহিনী থাকতেই হবে। তার মুসলিম তোষণও আগামী দিনে বাড়াবাড়ি স্তরে চলে যাবে। উল্টো দিকে তার প্রধানমন্ত্রী একজন সংস্কারপন্থী। ১৯৯১ সালে তিনিই দেশে উদারিকরণ ও বিশ্বায়নের স্লোগান তুলে বেসরকারীকরণের পথ সুগম করেছেন। ক্রমশ আমদানী শুল্ক কমিয়ে দিয়ে দেশীয় বাজার বিদেশী দ্রব্যে ভরে তুলেছেন। ফলস্বরূপ দেশীয় শিল্পসংস্থাগুলি ক্রমশ দুর্বল হয়েছে। তাঁর অর্থনৈতিক সংস্কার আসলে অর্থনৈতিক সংহার। মমতার সঙ্গে তাঁর সংঘাত অনিবার্য। বিজেপিকে এসবের বিরুদ্ধে এককভাবে মানুষের পাশে দাঁড়িযে লড়তে হবে। তাহলেই হারানো জায়গা আবার ফিরে পাবে। আন্দোলনের চাপেই মমতা কংগ্রেসের দিক থেকে মুখ ফেরাতে বাধ্য হবে। পরিশেষে আবার বলি, তৃণমূল স্তরে সংগঠন গড়ে তোলার কোনও বিকল্প নেই। পাড়ায় পাড়ায় পার্টি অফিস গড়ে তুলতে হবে। কারণ এইগুলো হল পরিকাঠামোর ভিত্তি, যার ওপর দাঁড়িয়ে থাকবে মূল কাঠামো। এর ফলে শুধু বিজেপি নয়, বাঁচবে হিন্দু ও হিন্দুস্থান।

মমতা অকৃতজ্ঞ রাজনীতিবিদ। তিনি যেন ভুলে না যান, প্রায় সব কেন্দ্রেই বিজেপি তার নিজস্ব ভোটব্যাঙ্ক অটুট রাখতে পেরেছে। কোনও কোনও কেন্দ্রে পেয়েছে দেড় লাখের উপর ভোট,কোথাও বা দু-লাখ। অতএব বোঝাই যাচ্ছে বিজেপির নিজস্ব ভোটব্যাঙ্ক একটা রয়েছে। একটু সংগঠনে মন দিলে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে কয়েকটি আসন লাভ অসম্ভব নয়।

লক্ষাধিক কাশ্মীরী পণ্ডিত ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত

সর্ববৃহৎ সংখ্যালঘু গোষ্ঠী হলেও বিধানসভায় প্রতিনিধি নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। প্রায় পঁচিশ বছর ধরে নিজদেশে পরবাসী হয়ে উদ্বাস্তু জীবনযাপন করছে লক্ষাধিক কাশ্মীরী পণ্ডিত। জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভার বিগত নির্বাচনে (২০০৮) তারা তাদের কোনও প্রতিনিধিকে রাজ্য বিধানসভায় পাঠাতে পারেনি। ১৯৫৬ সালের নির্বাচনেও রাজ্য বিধানসভায় তাদের চারজন প্রতিনিধি ছিলেন। এবার তা শূন্যে ঠেকেছে। দেশের নির্বাচন কমিশনও যে তাদেরকে ভোটদানের অধিকার থেকে বঞ্চি ত করেছে বিস্ময়ের হলেও তা রূঢ় বাস্তব সত্য। অথচ দেশের নির্বাচন কমিশন ভারতীয় দূরদর্শন তথা বিভিন্ন চ্যানেলে বারে বারে নানান সেলিব্রেটিদেরকে দিয়ে জনগণকে ভোটদানে উৎসাহিত করতে বিজ্ঞাপনের পর বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়েছে। অন্যদিকে লক্ষাধিক কাশ্মীরী পণ্ডিত ভোটদানের অধিকার থেকে বঞ্চি ত হওয়ার কারণে বিক্ষোভ দেখিয়েছে এবং প্রতিদানে প্রশাসনের কাছ থেকে পেয়েছে পুলিশের লাঠিচার্জ। জম্মুর মুথিতে ধর্ণা দেওয়া পণ্ডিতদেরকে লাঠিচার্জ করেছে জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ, কয়েকজন যুবককে গ্রেপ্তারও করেছে তারা।

জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের গণতান্ত্রিক সরকার প্রকৃতপক্ষে কাশ্মীর উপত্যকার মুসলমানদের সরকার। ১৯৪৭ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর পৃষ্ঠপোষকতায় উপত্যকার মুসলমানরা রাজ্যের সার্বিক নিয়ন্ত্রণভার লাভ করে। সেই গেমপ্ল্যান অনুসারেই হিন্দু ভোটারদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া চলতে থাকে। পরিসংখ্যান বলছে ১৯৯৬ সালের রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনে বাস্তুচ্যুত কাশ্মীরী পণ্ডিতদের মধ্যে নথিভুক্ত ভোটার ছিলেন ১ লক্ষ ৪৭ হাজার জন। তাদের মধ্যে ৯৭ হাজার ভোটার ভোট দিয়েছিলেন। ২০০২ সালে পণ্ডিতদের সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ১ লক্ষ ১৭ হাজারে।

এখানে উল্লেখ্য, ১৯৮৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অযোধ্যায় রামমন্দিরের তালা খোলার পর পরই কাশ্মীর উপত্যকায় হিন্দু কাশ্মীরী পণ্ডিতদের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার শুরু হয়। ভিটে মাটি ছেড়ে শুধুমাত্র জান-মান বাঁচাতে তারা জম্মু ও দিল্লীর রাস্তায় তাঁবুতে থাকা শুরু করেন। দু'এক বছরের মধ্যে কাশ্মীর উপত্যকা প্রায় পণ্ডিত-শূন্য হয়ে যায়।

ওই ১ লক্ষ ১৭ হাজারের মধ্যে মাত্র ৭৬/৭৭ হাজার কাশ্মীরী পণ্ডিতের নামই ভোটার তালিকায় থেকে যায়। তাদের মধ্যে মাত্র ১১ হাজারের মতো পণ্ডিত এবারের বিধানসভা নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পেরেছেন। এর কারণ 'ত' ফরম্ পূরণ করার জটিল ও দীর্ঘসূত্রী পদ্ধ তি। ওই পদ্ধ তিতে চল্লিশ হাজার কাশ্মীরী পণ্ডিত - পরিজন ভোটাধিকার প্রয়োগের অধিকার (বিধানসভার ভোটে) আদায়ের জন্য আবেদন করেছিলেন। কিন্তু তাদের মধ্যে মাত্র ২৬ হাজার জনকে কর্তৃপক্ষ ভোটদানের যোগ্য বলে বিবেচিত করে। আর মাত্র ১১ হাজার জনই ভোট দেন। আরও একটি কষ্টকর দিক হল 'এম' ফরমে আবেদনকারী জানতেও পারেন না তাকে ভোটাধিকার দেওয়া হল কি না। ভোটের দিন বুথে গিয়ে তালিকায় নাম আছে কি না তা দেখে আসতে হয়।

বাস্তুচ্যুত পণ্ডিতরা মনে করে তাদের পুরো দুর্ভোগটাই সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করে চালানো হচ্ছে। কাশ্মীর উপত্যকায় কাশ্মীরী হিন্দু পণ্ডিতদের ভালো সংখ্যায় উপস্থিতি কাশ্মীরী মুসলমানদের ভারত সরকারকে ব্ল্যাকমেল করার ব্যাপারটা লঘু করে দিতে পারে। আবার বিচ্ছিন্নতাবাদী মুসলমানদের ভয় হল — জোর-জবরদস্তি ভোট বয়কট করালে কেন্দ্র সরকার সাংবিধানিক সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারে। এদিকে যারা সব মূল স্রোতে থেকে রাজনীতি করেন তারাও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে কড়ায়গন্ডায় দরাদরি করতে ভয় পান। তখন দেখা যায়, বৈধ ভোটারদের দশ শতাংশকেই ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আর ৯০ শতাংশকেই ভোটাধিকার থেকে বঞ্চি ত করা হয়। ফলে কাশ্মীরী পণ্ডিতরা উপত্যকার সংখ্যালঘুদের সর্ববৃহৎ গোষ্ঠী হলেও তাদের কোন প্রতিনিধি রাজ্য বিধানসভায় নেই।

অথচ একথা সত্য যে, উপত্যকার বিতাড়িত উদ্বাস্তু কাশ্মীরী পণ্ডিতদের জন্য ভোটাধিকারের দাবি করা কোনও ছোট, সঙ্কীর্ণ বা স্বার্থান্বেষী মনোভাবের নয়। এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী এবং এই ভোটাধিকার আদায়ের লড়াইটা সারা বিশ্বেই বিস্তৃত হচ্ছে। যারা সর্বপন্থ সমভাব, গণতন্ত্র, সকলের জন্য সমানাধিকারের আদর্শে বিশ্বাসী তাদের কাছে এই বিষয়টা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। ভোটাধিকার থেকে কাশ্মীরী পণ্ডিতদের বঞ্চি ত করা হলে তা হবে গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে চরম বিশ্বাসঘাতকতা। এবং জেহাদিরা সেক্ষেত্রে দুটি সভ্যতার মধ্যে পারস্পরিক যে সঙ্ঘাত চাইছে তাকেই ত্বরান্বিত করা হবে। এর বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে সমস্বরে প্রতিবাদ হওয়া যে দরকার এ বিষয়ে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন নাগরিকদের কোনও সন্দেহ নেই।

গত বছরের নভেম্বর ও ডিসেম্বরে বিধানসভা এবং এবছরের এপ্রিলে সংসদীয় নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে ভোটার তালিকা সংশোধন করা হয়েছে। সারা জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যে ভোটারদের সংখ্যা ৬৫ লক্ষ থেকে বেড়ে ৬৫ লক্ষ ৫৮ হাজার ৯৫৭ হয়েছে। কাশ্মীর উপত্যকার ভোটারদের সংখ্যা ৩২.৬০ লক্ষ থেকে বেড়ে ৩৩.২১ লক্ষ হয়েছে। অথচ জম্মু এলাকায় উল্টো চিত্র। সেখানে ভোটার সংখ্যা ৩০.৮৪ লক্ষ থেকে কমে ৩০.৮৩ লক্ষ এ দাঁড়িয়েছে। যদিও ৩৫ হাজার পাকিস্তানী উদ্বাস্তুকে লোকসভার ভোটে নতুন করে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, ওই ৩৫ হাজার নতুন ভোটার পাকিস্তানী মুসলমান। বিগত পি ডি পি এবং কংগ্রেস জোট মন্ত্রীসভা বিধানসভায় এক আইন পাস করেছিল এবং সেখানে বলা হয়েছিল, পাকিস্তান থেকে আগত মুসলমানদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। তখন এনিয়ে বিজেপিই একমাত্র রাজনৈতিক দল যারা প্রতিবাদ জানিয়েছিল। বলা বাহুল্য ফারুক আবদুল্লার আমলেই একটা ষড়যন্ত্রমূলক সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, হিন্দুবহুল জম্মু এলাকায়পাকিস্তানী মুসলমানদের বসতি স্থাপন করা হবে। এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হওয়ার ফলে জম্মুর ডোডা সহ বেশ ক'টি জেলায় হিন্দুরা বর্তমানে সংখ্যালঘু।

বিতাড়িত হিন্দু পণ্ডিতদের বিষয়টাকে কার্পেটের তলায় চাপা দিলে ইতিহাস কোনওদিন ক্ষমা করবে না।

এইসবের পিছনে যে গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে তার লক্ষ্য হল — কাশ্মীর উপত্যকায় পণ্ডিতদের শারীরিক উপস্থিতিকে অর্থহীন করে দেওয়া। এখন দেখার নতুন কেন্দ্র সরকার এই ভাগ্য বিড়ম্বিত বিতাড়িতদের জন্য কিছু করেন কিনা! একটা স্লোগান ওখানে শোনা যাচ্ছে —

শিবালয় অব যো রোতে হ্যায়
হিমালয় কব কে রোয়ে হ্যায়।।

আয়লার তাণ্ডবে দিশাহারা বামফ্রন্ট

(১ পাতার পর)

দেওয়া ঠিক হবে না। সবার আগে মুখ্যমন্ত্রীকে শ্বেতপত্র প্রকাশ করে রাজ্যবাসীকে জানাতে হবে কেন তাঁর 'উন্নততর প্রশাসন' মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে রাজ্যবাসীকে ধাপ্পা দিয়েছিল। তাঁকে জানাতে হবে বিগত দশ বছরে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবিলার জন্য রাজ্য সরকার কত টাকা কেন্দ্রীয় সাহায্য বাবদ পেয়েছে। সেই অর্থ কীভাবে কোন খাতে খরচ করা হয়েছে। ঘটা করে মহাকরণে বৈঠক করা আর আলিমুদ্দিনে গুজ্‌গুজ্ ফুসফাস করে পার পাওয়া যাবে না। রাজ্যবাসীর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গেছে। সে কথাটি মনে না রাখলে বামপন্থীদের চরম লাঞ্ছনায় পড়তে হবে।

প্রসঙ্গত, অতীতের একটি ঘটনার উল্লেখ করলে বোঝা যাবে বুদ্ধ বাবুর প্রশাসন কতটা জনবিরোধী। ঘটনাটি কলকাতার একটি বাংলা দৈনিকের প্রথম পাতায় বেশ বড় করে ছাপা হয়েছিল। সর্বশেষ বিধানসভার নির্বাচনের বুদ্ধ বাবুর উন্নততর বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে আন্তর্জাতিক সংস্থা ইউনিসেফের আর্থিক ও কারিগরি সাহায্যে অঞ্চ লভিত্তিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় একটি প্রকল্প রাজ্য সরকার ঢাকঢোল পিটিয়ে গ্রহণ করেছিল। এই প্রকল্পে ছিল দুর্যোগে বিপন্ন মানুষজনকে দ্রুত উদ্ধার করে আশ্রয় শিবিরে নিয়ে যাওয়া এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। এইসব শিবিরে খাদ্য ও পানীয় জলের আগাম মজুত রাখা ইত্যাদি। এই প্রকল্পটির রূপায়ণের দায়-দায়িত্ব ছিল অসামরিক প্রতিরক্ষা দফতরের। এই দফতরটির মন্ত্রী শ্রীকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রকল্পের আওতায় ছিল উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর মালদা, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা এবং নদীয়া। রাজ্যে ঘূর্ণিঝড়ের বিপর্যয়ের পর মহাকরণে সাংবাদিকরা অসামরিক প্রতিরক্ষা দফতরের সচিবের কাছে প্রকল্পটি সম্পর্কে জানতে চাইলে সচিব এ কে সিং বলেন, ইউনিসেফের এই প্রকল্পটি পরে রাজ্য সরকার কেন বাতিল করেছিল তা তাঁর জানা নেই। তাঁর দফতরকে বাতিলের কোনও কারণ জানানোর প্রয়োজন আছে বলে রাজ্য সরকারের মুখ্যসচিব মনে করেননি। অবশ্য তখন বর্তমান মুখ্যসচিব অশোকমোহন চক্রবর্তী ওই পদে ছিলেন না। এই ঘটনা প্রমাণ করে বুদ্ধ বাবুর প্রশাসন কতটা জনবিরোধী।

শুধুমাত্র টাটাদের পায়ে তেল দিলেই পশ্চি মবঙ্গের উন্নয়ন যে হয় না সেই বোধটুকুও কম্যুনিস্টরা হারিয়েছে।

আন্তর্জাতিক ড্রাগ ম্যাপে মুর্শিদাবাদ

(১ পাতার পর)

আগে গাঁজা গাছের চারা বড় হলে তা থেকে পাতা ছিঁড়ে শুকিয়ে ছোট মেশিনে পেষাই করে ঝাড়াই বাছাই করা হতো। এখন এই ধরনের নানা প্রসেসিং কারখানা চালু হয়েছে লালগোলা, ভগবানগোলা ও নওদাতে। এই প্রসেসিং কারখানায় কেমিক্যাল মিশিয়ে তৈরি হচ্ছে হেরোইন এবং ব্রাউন সুগার। কারখানাগুলিতে প্রসেসিং করার পর বাংলাদেশ হয়ে তা চলে যাচ্ছে বিশ্বের নানা প্রান্তে।

বিশ্বের মাদক ব্যবসায়ীদের কাছে এজন্য মুর্শিদাবাদ একটি অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

পুলিশের মতে এসব দেখার দায়িত্ব নারকোটিকস দপ্তরের। আর নারকোটিকস কন্ট্রোল ব্যুরোর অফিসারদের মতে, তাঁদের স্থানীয় পুলিশের উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। তাঁদের সোর্স বেস খুব ভাল নয়। ফলে অনেকক্ষেত্রেই কিছু করার থাকে না।

বাংলাদেশি মাদক ব্যবসায়ীদের সুবিধা হয়েছে মুর্শিদাবাদ সীমান্ত অঞ্চ লগুলিতে দরিদ্র মুসলিমদের বসবাস থাকায়। একই ধর্মের মানুষ হওয়ায় প্রথমে সাহায্যের নাম করে এই ব্যবসায় উৎসাহ যোগায়, পরে অর্থের লোভে সবাই রাজী হয়। রাজনৈতিক নেতারা উপঢৌকনের লোভে চুপ থাকে, পুলিশকেও ম্যানেজ করা হয়।

আশ্রয়ের খোঁজে পরেশ

(১ পাতার পর)

করছে, শেখ হাসিনার বাংলাদেশ থেকে পাট চোকার পরে নতুন আশ্রয়ের খোঁজে চীনে পাড়ি জমিয়েছেন পরেশ বড়ুয়া। যদিও আপাতত তাঁর লক্ষ্য কিছু অস্ত্রশস্ত্রের সন্ধান করা। কিন্তু তাঁর পরবর্তী লক্ষ্য বেশ সুদূর প্রসারী, যা গোয়েন্দাদের কপালে উদ্বেগের ভাঁজ ফেলেছে।

পরেশ বড়ুয়া ইতিপূর্বে ব্যাঙ্কক ও পাকিস্তান ভ্রমণ করেছেন, কিন্তু তাঁর চীন ভ্রমণ এই প্রথম। এরপরে যদি বলা হয়, 'টেররিজম ইন নিউ ডাইমেনশন', তবে তা কি কোনভাবেই অত্যুক্তির দাবি রাখে?

রাজ্য রাজনীতি

সি পি এমের কোমর ভেঙে গেছে
ওরা উঠে দাঁড়াতে পারবে না

নিশাকর সোম

লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলে সিপিএম-এর কোমর ভেঙে গেছে। তাই দার্জিলিং জেলাতে তিন পুরসভার নির্বাচনে "অত্যাচার-নিপীড়নের ভয়ে" অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে।

সিপিএম-এর ''কোমর ভাঙার'' অবস্থাটা সদ্য সমাপ্ত রাজ্য কমিটির একদিনের সংক্ষিপ্ত অধিবেশনে প্রকটিত হয়ে গেছে। সেখানে শুধু বাঁকুড়া জেলার সম্পাদক অমিয় পাত্র ও পশ্চিম মেদিনীপুরের সম্পাদক দীপক সরকার জোর দিয়ে বলেছেন যে এই অবস্থা কেটে যাবে।

এছাড়া এঁরা দু'জন রাজ্য নেতৃত্ব অর্থাৎ বিমান-শ্যামল -সূর্যকান্ত-বিনয় কোঙার-এর তীব্র সমালোচনা করে বলেছেন, এঁরা ব্যর্থ নেতা। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ও নিরুপম সেনকেও এই পরাজয়ের অন্যতম কারণ বলে তারা বর্ণনা করেছেন।

রাজ্য কমিটির এই সভায় অধিকাংশ সদস্য একদিনের সভা ডাকাকে সমালোচনা করে বলেছেন যে, রাজ্য নেতৃত্ব অর্থাৎ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী তৃতীয় ফ্রন্টের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের হাওয়ার অজুহাত দেখিয়ে থোড় বড়ি খাড়া-খাড়া বড়ি থোড় করে নির্বাচনী পর্যালোচনা শেষ করতে চেয়েছিলেন। তা' হতে পারেনি। জুন মাসে আরও দু'দিন রাজ্য কমিটির সভা ডাকতে বাধ্য হয়েছেন বিমান বসু। সমালোচনায় মুখর হয়েছেন ব্যারাকপুরের তড়িৎ তোপদার ও অমিতাভ নন্দী। এঁরা পার্টির মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব-এর প্রভার-এর উল্লেখ করে বলেন, এই গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব নির্বাচনী ফলাফলকে প্রভাবিত করেছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন, সুভাষ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে বহু সমালোচনা হওয়া সত্ত্বেও তিনি চুপ করেছিলেন।

দার্জিলিং-এ পার্টি কোণঠাসা অবস্থার জন্য মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য ও মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব বসুকে দায়ী করা হয়েছে। শোনা যায় অশোক ভট্টাচার্যকে নাকি ''অশোক আগরওয়াল'' বলে অভিহিত করা হয়।

সব থেকে উল্লেখ্যযোগ্য ঘটনা হল, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তথা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের পারিবারিক বন্ধু উত্তর কলকাতার পরাজিত প্রার্থী মহঃ সেলিমও রাজ্য নেতৃত্বকে ব্যর্থ বলে তীব্র সমালোচনা করেছেন। শোনা যায়, রাজ্য নেতারা কেউ কেউ নাকি বলেছেন, মহঃ সেলিম তো কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা। তিনি তো বিপর্যয়ের আগাম খবর দিতে পারেননি। পরন্তু তিনি জিতবেনই বলেছিলেন।

রবীন দেবের পরাজয়ের ব্যবধান এবারে অনেক বেড়ে গেছে। রবীনবাবুর নিজস্ব মত হল, তিনি বিধানসভা নির্বাচনেই পার্ক সার্কাস অঞ্চলেই ধাক্কা খেয়েছিলেন। প্রশ্ন এখানেও উঠেছে, সেই ক্ষত মেরামতিতে রবীনবাবুর উদ্যোগ কোথায় ছিল? সকলেই ওয়ান ডে ম্যাচ" করার জন্য সমগ্র প্রস্তুতি চালিয়েছিলেন!

সব থেকে উল্লেখ্যযোগ্য ঘটনা হল, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তথা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের পারিবারিক বন্ধু উত্তর কলকাতার পরাজিত প্রার্থী মহঃ সেলিমও রাজ্য নেতৃত্বকে ব্যর্থ বলে তীব্র সমালোচনা করেছেন।

রাজ্য কমিটির সভায় বিভিন্ন সদস্যদের বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে বুদ্ধবাবুর নেতৃত্বাধীন সরকার সবক্ষেত্রেই জনসাধারণকে পরিষেবা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বুদ্ধবাবু 'টিম স্পিরিট" জাগাতে পারেননি। বুদ্ধবাবুকে উদ্ধত দাম্ভিক একরোখা, সর্বোপরি পার্টিকে বাদ দিয়ে কাজ করার ঝোঁক থাকার কথাও বলা হয়েছে। এও বলা হয়েছে, বুদ্ধবাবুকে পার্টি সভ্য কর্মীরা চিঠি লিখলে তিনি তার প্রাপ্তি স্বীকার করেন না। জ্যোতিবাবুর আমলে জয়কৃষ্ণ ঘোষ এটা করতেন। রাজ্য কমিটির সভাতেই কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং হুগলী জেলার নেতৃত্ব পরিবর্তনের কথাও উঠেছে। এই চারটি জেলার সম্পাদকদের একটু পরিচয় দিচ্ছি — এটি উত্তর কলকাতার জনৈক নেতার কাছ থেকে সংগৃহীত। কলকাতা জেলার সম্পাদক হলেন রঘুনাথ কুশারী। তিনি জয়া তথা ঊষা কোম্পানির সেলস-এ কাজ করতেন। তাঁকে পার্টির হোলটাইমার এবং জেলা কমিটিতে বর্তমানে সরে যাওয়া নেতা বিমল চ্যাটার্জি এনেছিলেন। ইনি কোনওদিনই হাতে-কলমে শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করেননি। আসলে কলকাতা জেলা কমিটির সদস্যগণ ভাষণ দান করা ছাড়া হাতে-কলমে কিছুই কাজ করে না। উত্তর ২৪ পরগনার জেলা সম্পাদক অমিতাভ বসু (বড়দা) অসুস্থ —শ্যাম রাখি না কুল রাখি অবস্থা তাঁর। তাঁর ক্ষমতা নেই সুভাষ চক্রবর্তীর মতো ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার সম্পাদক হলেন শান্তিময় ভট্টাচার্য (দেবব্রত)। ইনি জেলা কমিটিতে সংখ্যালঘু। ইনি কি পারেন কান্তি গাঙ্গুলী বা রেজ্জাক মোল্লাকে সামলাতে? প্রসঙ্গত ডঃ সুজন চক্রবর্তী শান্তিবাবুর জামাই। শান্তিবাবুর উপর রোষের ফল কি সুজনবাবু পেলেন?

হুগলী জেলার সম্পাদক বিনোদ দাশ বৃদ্ধ অশক্ত অসুস্থ। তিনি পারেন জেলার দুই প্রধান যুযুধান গোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণ করতে! ফলে এই চারটি জেলাতেই পার্টির মধ্যে গোষ্ঠীবাজি চরমে।

রাজ্য কমিটির সভায় নদীয়া জেলার কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মৃদুল দে'র সমালোচনায় বলা হয়েছে যে তিনি নদীয়া জেলার দায়িত্বে ছিলেন — তাঁর অবদান হল — নদীয়া জেলাতে পার্টি উঠে গেছে।

উল্লেখ্য, অলকেশ দাশ বা অলোক

(এরপর ৬ পাতায়)

অন্য রকম

গানে ভুবন ভরিয়ে

এমনও হয়। পৃথিবীর আলো থেকে বঞ্চিত ওরা। ওদের চোখ কোনওদিন সূর্যকে দেখেনি। দেখেনি আকাশ, তাঁরা, চাঁদ, নক্ষত্র। ওরা জানে না পৃথিবীটা কেমন। রঙিন না অন্ধকার। মুম্বাইয়ের মঞ্জুরা প্রকৃতির রূপ সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত। কাছের মানুষের কাছেও মঞ্জুরা যেন পর। তবে ওদের সব অভাব মিটিয়ে দিয়েছে সঙ্গীত। গানই উপহার দিয়েছেনতুন ভুবন। যেখানে শুধুই ওদের আর সঙ্গীতপ্রেমীদের বিচরণ। মঞ্জুরাও গান গেয়ে দিব্যি ভুবন ভরিয়ে দেয়। গানের মধ্যেই ওরা খুঁজে পেয়েছে আলোর ছটা। সঙ্গীতের চর্চাতেই মঞ্জুদের সময় কেটে যায়। পার হয়ে যায় দিন, রাত।

মুম্বাইয়ের 'দেবশ্বর অর্কেস্ট্রা'। মঞ্জু মাগোওদের হাতেই গড়ে ওঠে এই অর্কেস্ট্রা। যেখানে সকলেই দৃষ্টিহীন। মঞ্জুর মতো ওরাও চোখে দেখতে পায় না। তবে সঙ্গীতের 'অ-আ-টা' ভালো বোঝে। ওদের 'মিউজিক সেন্স' ধরতে পারে কোনটা গান, আর কোনটা গান নয়। মঞ্জুর বাহিনীও একদিন টিভির পর্দায় জায়গা করে নিয়েছে। অংশ নিয়েছে অন্তাক্ষরি-র মতো সঙ্গীত প্রতিযোগিতায়। শুধু তাই নয়, মঞ্জুও একদা 'স্টার ভয়েস অফ ইন্ডিয়া' প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসাবে কাজ করেছে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দেবশ্বর টিমের ডাক পড়ে। মুম্বাইয়ের পার্শ্ববর্তী শহরেও এই টিমের খ্যাতি রয়েছে যথেষ্ট।

আট দশ জনের টিম যখন মঞ্চে ওঠে, তখন বোঝা দুষ্কর ওরা কোনও প্রতিবন্ধী কিনা। মনে হয় সত্যিই ওরা প্রতিবন্ধী নয়, প্রতিদ্বন্দ্বী। সঙ্গীতের জগতে দেবশ্বর অর্কেস্ট্রার টিমের সদস্যরা এক একজন দিকপাল। মঞ্জু নিজে সঙ্গীতের ওপর ডিপ্লোমা করেছে। অন্যরাও শিক্ষায়-দীক্ষায় কম যায় না। সকলেই উচ্চশিক্ষিত। গ্র্যাজুয়েট। সঙ্গীতের সবকিছুই নখদর্পণে।

মুম্বাইয়ের দেবেশ্বর অর্কেস্ট্রা গানে ভূবন ভরিয়ে দেয়।

গানপ্রেমীরাও মঞ্জুদের গান শুনতে ভালোবাসে। মঞ্জুদের অনুষ্ঠানে কোনওদিন মাঠ ফাঁকা থাকেনি। শ্রোতারাই ভিড় জমান। করুণা করে নয় —গানের টানেই। মঞ্জুরা দেখতে পায় না শ্রোতাদের। কিন্তু অনুভব করতে পারে। শুনতে পায় দর্শকদের করতালি। বুঝতে পারে শ্রোতাদের আনন্দ-উচ্ছ্বাস। ভালো লাগা;ভালো না লাগা।

গান বিক্রি করে টাকা রোজগার — এমন প্রবৃত্তি মঞ্জুদের নেই। ওরা গান ভালোবেসে গান গায়। গানে শ্রোতাদের ভুবন ভরিয়ে দেয়। নিজেদের প্রয়োজনটুকু তা থেকেই মিটে যায়। এর বেশি নয়। মঞ্জুরা চায় নিজেকেই নিজেদের জন্য উপযোগী করে তুলতে।

এই সাধনায় ওরা সফল। সমাজের গানপ্রেমীরা ওদের পাশে। সাধারণ মানুষও ওদের সঙ্গে।

সরকারি তদন্ত কমিটির রিপোর্ট

অস্থিরতা সৃষ্টি করতেই বি ডি আর বিদ্রোহ

বিশেষ প্রতিনিধি।। বি ডি আর বিদ্রোহ তথা হত্যাকাণ্ড নিয়ে গঠিত সরকারি তদন্ত কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে, কতিপয় মামুলি দাবি এত বড় একটি নারকীয় ঘটনার জন্য মূল কারণ হতে পারে না। এ দাবিগুলোকে সামনে রেখে মূল কুশীলব নেপথ্যে থেকে রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা বিপন্ন করার জন্য পরিকল্পনা মাফিক কলকাঠি নেড়ে থাকতে পারে। কমিটি এ নারকীয় হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত তথ্য জানার জন্য আরও তদন্তের প্রয়োজন উল্লেখ করে, বি ডি আর বিদ্রোহের ঘটনায় সকল অপরাধীর সেনা আইনে বিচার করার সুপারিশ করেছে। পাশাপাশি বিভিন্ন জাতীয় সঙ্কট মোকাবিলায় সর্বোচ্চ পর্যায়ের একটি 'জাতীয় সঙ্কট মোকাবিলা কমিটি' অবিলম্বে গঠনেরও সুপারিশ করা হয়। উল্লেখ্য, গত ২১ ফেব্রুয়ারি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে কমিটির রিপোর্ট জমা দেন কমিটির চেয়ারম্যান আলিমুজ্জামান।

তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয়, বি ডি আর বিদ্রোহের মোটিভ ছিল চেন অব কমাণ্ড ধ্বংস করে বি ডি আরকে অকার্যকর করা। সেনা কর্মকর্তাদের নৃশংসভাবে হত্যার মাধ্যমে ভবিষ্যতে সেনা কর্মকর্তাদের ওই সংস্থায় যেতে নিরুৎসাহিত করা, সেনাবাহিনী এবং বি ডি আর-কে মুখোমুখি সংঘর্ষের অবস্থানে দাঁড় করানো, সামগ্রিকভাবে সেনাবাহিনীকে ক্ষতিগ্রস্ত করা, নবনির্বাচিত সরকারকে অস্থিতিশীল করা, দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা নষ্ট করা, বহির্বিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করা এবং জাতিসঙ্ঘ শান্তিরক্ষা মিশনে দেশের অংশগ্রহণ ক্ষতিগ্রস্ত করা। পিলখানার অভ্যন্তরে জিম্মিদের বাস্তব অবস্থা না জেনে সামরিক অভিযান পরিচালনা করা হলে সারা দেশে গৃহযুদ্ধের মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারত। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থাকেও বিপন্ন করে তুলতে পারত। রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারীদের সিংহভাগই ২৫ ফেব্রুয়ারি রাতের অন্ধকারে এবং ২৬ তারিখের মধ্যে পালিয়ে যায়। পলায়নকালে অতি উৎসাহী বেসামরিক ব্যক্তিরা বিদ্রোহীদের কাপড়, খাবার ও জল সরবরাহ করে। এদের নেতৃত্ব দেয় বি এন পি-র সাবেক ওয়ার্ড কমিশনার সুরাইয়া বেগম, তার দুই ছেলে, স্থানীয় সন্ত্রাসী মাসুদ ও সন্ত্রাসী লেদার লিটন। বেশ কিছু বিদ্রোহীকে পালাতে কেরাণীগঞ্জে ইঞ্জিনচালিত নৌকো দিয়ে সহায়তা করে বি এন পি-র সাবেক সংসদ সদস্য নাসিরুদ্দিন আহমেদ পিন্টু। তবে কমিটি বি ডি আর বিদ্রোহের ঘটনায় জঙ্গিবাদ ও বিদেশী কোনও রাষ্ট্রের যোগসূত্র পায়নি বলে জানিয়েছে।

অন্যদিকে বি ডি আর বিদ্রোহের ঘটনা নিয়ে সেনাবাহিনীর গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জমা না দেওয়া সত্ত্বেও তার বেশ কিছু অংশ সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। এতে অবশ্য নতুন কিছু নেই। এতদিন বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃত্বসহ বিভিন্ন মহল থেকে যা বলা হয়েছিল তারই প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে।

বি ডি আর বিদ্রোহের তদন্ত রিপোর্টের সারাংশ জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করা হয়েছে। এই উপলক্ষে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে। এতে তদন্ত রিপোর্টের সারাংশ তুলে ধরেন কমিটির চেয়ারম্যান সাবেক সচিব আনিস-উজ-জামান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তানজিম আহমেদ, স্বরাষ্ট্র সচিব আবদুস সোবহান সরকার, বি ডি আর-এর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মইনুল ইসলাম প্রমুখ। রিপোর্টে সরকারের কার্যকর পদক্ষেপের জন্য স্বল্পমেয়াদী আটটি এবং দীর্ঘমেয়াদী ১৫টি সুপারিশ করা হয়েছে।

বি ডি আর বিদ্রোহের পটভূমি সম্পর্কে রিপোর্টে বলা হয়, বি ডি আর সদস্যদের মধ্যে সেনা কর্তৃত্ব মেনে না নেওয়ার মানসিকতা দীর্ঘদিন থেকে প্রচ্ছন্ন ছিল। তারা নিজেদের সংগঠিত করতে থাকে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সাক্ষাতের প্রয়াস পায়। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে দাবি-দাওয়ার ব্যাপারে আশানুরূপ সাড়া না পেয়ে তাদের মধ্যে অস্থিরতা দেখা দেয়। এ অবস্থায় তারা তাদের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি গোপন বৈঠক করে

সাংবাদিক সম্মেলনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন, প্রতিমন্ত্রী তানজিম আহমেদ, স্বরাষ্ট্র সচিব আবদুস সোবহান এবং বি ডি আর প্রধান মইনুল ইসলাম।

বি সি এস ক্যাডারের আদলে নিজস্ব অফিসার নিয়োগ সহ সীমান্ত ভাতা বৃদ্ধি, একশ ভাগ রেশন ভাতা প্রদান, জাতিসংঘ মিশনে প্রেরণ, সেনাবাহিনীর আদলে বেতন কাঠামো পুনর্বিন্যাস ইত্যাদি দাবি জানিয়ে আসছিল। পাশাপাশি ডাল-ভাত কর্মসূচী, সৈনিকদের শাস্তি প্রদান, কর্মকর্তাদের বিলাসবহুল জীবন, স্কুল পরিচালনায় দুর্নীতি ইত্যাদি বিষয়ে সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে নানা অভিযোগ ও অসন্তোষ ছিল। এসব অসন্তোষপ্রসূত ক্ষোভ ও দাবিদাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে তারা বিভিন্ন সময়ে লিফলেট বিলি করেছে।

বিদ্রোহের পরিকল্পনা সম্পর্কে বলা হয়, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে একদল বি ডি আর সদস্য তাদের এ সকল দাবি-দাওয়া নিয়ে ২৫ ফেব্রুয়ারির দরবারে ডি জি সহ অন্য সেনা কর্মকর্তাদের পণবন্দী করার পরিকল্পনা করে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য তারা অস্ত্রাগার লুঠ, সদর দফতরের বিভিন্ন প্রবেশপথ সহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। সাধারণ সৈনিকদের ধারণা ছিল, দরবারে এ সকল দাবি আদায়ের লক্ষ্যে সৈনিকদের পক্ষ থেকে কঠোর অবস্থান নেওয়া হবে। কিন্তু এর প্রকৃত ধরন সম্পর্কে তারা জানত না। মহাপরিচালক সহ বি ডি আর কর্মকর্তাদের হত্যার জঘন্য অপকর্মের পরিকল্পনা শুধু কতিপয় হার্ডকোর বিদ্রোহীর জানা ছিল। বিদ্রোহের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নকারীদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ছিল ডি এ ডি তৌহিদ, ডি এ ডি হাবিব, ডি এ ডি জলিল, ডি এ ডি নাসির, নায়েক জাকারিয়া, সিপাই ওয়াবেদ প্রমুখ।

বিদ্রোহের প্রকৃত কারণ সম্পর্কে বলা হয়, এ নারকীয় হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত কারণ ও উদ্দেশ্য নির্ণয় করা যায়নি.। প্রকৃত কারণ জানার জন্য আরও তদন্তের প্রয়োজন। সাধারণ বি ডি আর সদস্যদের মধ্যে সেনা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিরাজমান নেতিবাচক মনোভাব এবং তাদের অপূর্ণ দাবি-দাওয়া নিয়ে বিদ্যমান ক্ষোভ ও অসন্তোষকে বিদ্রোহের প্রাথমিক কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। তবে কতিপয় মামুলি দাবি এত বড় একটি নারকীয় ঘটনার মূল কারণ হতে পারে না।

সাধারণত বি ডি আর সদস্যদের মাঝে বিষবাষ্প ছড়ানোর কাজে এগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। এ দাবিগুলোকে সামনে রেখে মূল কুশীলব নেপথ্যে থেকে রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা বিপন্ন করার জন্য পরিকল্পনা মাফিক কলকাঠি নেড়েথাকতে পারে। বাংলাদেশে এই ঘটনার সুদূরপ্রসারী প্রভাব হতে বাধ্য। নির্বাচিত নতুন সরকারকে ২৫ ফেব্রুয়ারির বি ডি আর বিদ্রোহ একটি মারাত্মক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করে। যা ছিল গণতন্ত্রের জন্য প্রচণ্ড হুমকি স্বরূপ। এই বিদ্রোহ বাংলাদেশের স্থিতিশীলতার জন্যও হুমকি ছিল। এতে সেনাবাহিনী অনেক মেধাবী ও যোগ্য কর্মকর্তাকে হারিয়েছে। প্রতিষ্ঠান হিসেবে বি ডি আর ধ্বংসের কাছাকাছি পৌঁছেছে। সেনাবাহিনীও সামগ্রিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

জাতিসংঘের শান্তি মিশনে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী যে সুনাম অর্জন করেছে, তা হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। সশস্ত্র বাহিনীর মনোবলে যে আঘাত এসেছে তা কাটিয়ে উঠতে অনেক সময় লাগবে।

(সৌজন্যে ঃ দৈনিক জনকণ্ঠ)

সি পি এমের কোমর ভেঙে গেছে

(৫ পাতার পর)

মজুমদারদের কি দোষ পার্টি কখনও জানায়নি। অথচ তাঁদের শাস্তি দেওয়া হয়েছে! অলোক মজুমদার বুঝিয়ে দিয়েছেন যে তিনি না থাকার জন্যই উত্তর কলকাতায় পার্টি ধসে গেছে। পার্টিতে ধসা রোগ ঢুকে গেছে। পচন অবধারিত। আর উঠে দাঁড়াতে পারবে না।

একটা কথা উল্লেখ করা দরকার। সম্প্রতি মন্ত্রী রেজ্জাক মোল্লাকে ভূমি পর্ষদের দায়িত্ব ফেরৎ দেওয়া হয়েছে— তাঁকে এর আগে বিদায়ের কিনারায় ঠেলে দেওয়া হয়েছিল।

রেজ্জাক সাহেব বলেছেন, ''আমি পর্ষদের কাজ বুঝতে বুঝতে ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচন এসে যাবে। কাজেই কাজের কাজ কিছু করা যাবে না। খালি বদনাম কুড়ানো হবে।'' এটা স্পষ্ট সিপিএম আর উঠে দাঁড়াতেপারবে না।

উল্লেখ্য, সিপিএম-এর রাজ্য কমিটি সভার পূর্বে বামফ্রন্ট এবং মন্ত্রিসভার বৈঠক হয়।

বামফ্রন্টের সভায় সি পি আই নেতা নন্দগোপাল ভট্টাচার্য বলেন, ''জাহাজ বেপথে গেলে কাপ্তানের শাস্তি হয়, কোচেরও বদল হয়। এখানে কি হবে?'' নন্দবাবুর তীর বুদ্ধ দেববাবুর দিকে। উল্লেখ করা দরকার, সিঙুর-নন্দীগ্রাম ঘটনার প্রাথমিক স্তরে মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে নন্দবাবুকে নাকি বুদ্ধ দেববাবু ''অপমান সূচক'' কথা বলেন। তখন নন্দবাবু বলেন যে তিনি বুদ্ধ বাবুর থেকে রাজনীতিতে অনেক সিনিয়র। নন্দবাবুর প্রচেষ্টাতেই ফরওয়ার্ড ব্লক, সিপি আই, আর এস পি সভা করে বলে যে নন্দীগ্রামের ঘটনার দায়দায়িত্ব একমাত্র সিপিএম-এর। তাঁরা পুলিশি অভিযানের তীব্র নিন্দাও করেন। এরপরেই সিপিআই ফরওয়ার্ড ব্লক আর-এস-পি ''মিনিফ্রন্ট'' গড়ে একত্রে চলে। এই মিনি ফ্রন্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা অশোক ঘোষ মমতাকে নিয়ে সভা ডাকেন এবং মমতাকে নেত্রী বলে অভিহিত করেন।

বামফ্রন্টের সভায় আর এস পি সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম তথা বুদ্ধ বাবুকে পরাজয়ের মূল কারণ বলে জানায়।

বামফ্রন্টের সভায় ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা অশোক ঘোষ বলেন যে, আমাদের দোষেই আজ এই ফল। এথেকে শিক্ষা নিতে হবে। ঠিক হয় প্রত্যেক পার্টি নির্বাচনী পর্যালোচনা করে বামফ্রন্টের আলোচনায় বসবে।

উল্লেখ করা প্রয়োজন, মন্ত্রিসভার বৈঠকে আর এস পি মন্ত্রীগণ সরাসরি বুদ্ধবাবুকে প্রধান দোষী বলে অভিহিত করেন। ক্ষিতি গোস্বামী বলেন — সিপিএম ক্যাডাররা পুলিশের উর্দি পরে গুলি চালিয়েছে।

বামফ্রন্টের সব দলই বুঝেছে যে সিপিএম ধসে গেছে। সিপিএম মমতা আতঙ্কে ভীতিগ্রস্ত।

সিপিআই-এর নিচের তলার কর্মীরা চান বুদ্ধবাবুকে সরিয়ে অন্যজনকে মুখ্যমন্ত্রী করা। কারণ বুদ্ধ বাবুকে সামনে রেখে আর উঠে দাঁড়ানো যাবে না।

আর এস পি-এর নিচের তলার কর্মীরা চান সমগ্র মন্ত্রিসভার পদত্যাগ এবং বামফ্রন্ট পরিত্যাগ করা।

ফরওয়ার্ড ব্লকের নিচের তলার প্রতিটি কমিটি সমগ্র মন্ত্রিসভার পদত্যাগ এবং বিধানসভা নির্বাচনে জনমত যাচাই করার কথা বলছেন। প্রসঙ্গত নিচের তলায় সিপিআই, আরএসপি এবং ফরওয়ার্ড ব্লক-এর সভ্য-কর্মী-দরদী সকলেই তৃণমূল জোটকে ভোট দিয়েছে— কেবল নিজ নিজ প্রার্থী বাদে। এই কথা সিপিএম-এর রাজ্য কমিটির সভাতেও উত্থাপন করা হয়েছে। অবস্থা দৃষ্টে এটা বলা যায় যে সিপিএম নেতৃত্ব তথা সিপিএম মন্ত্রীদের সম্বন্ধে সাধারণ বামপন্থী কর্মীদের আর কোনও আস্থা বা বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। হাজার চেষ্টা করলেও আর এস পি, ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা কর্মী দরদীদের সিপিএম-কে সমর্থন করানো যাবে না। এই সমস্ত দলের কর্মীরা মনে করেন আগামী সবকটি নির্বাচনে টি এম সি-এর সঙ্গে গোপনে তলায় তলায় — কেউ কেউ মনে করেন বামফ্রন্ট ছেড়ে প্রকাশ্য বোঝাপড়া দরকার। এমতাবস্থায় ১৯টি পুরসভার আসন্ন নির্বাচনে সিপিএম কোণঠাসা হবেই। কলকাতা পুরসভায় বাম দলগুলি সিপিএম মেয়রকে দোষীর কাঠগোড়ায় দাঁড় করাবেই। কলকাতা জেলার সিপিএম নেতারাও মনে করেন মেয়র একটি ব্যর্থ অপদার্থ।

কাজেই আগামী দিনে আবার পরাজয় আসবে।

উত্তরপ্রদেশেও ঘাঁটি গেড়েছে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা

সংবাদদাতা ।। উত্তরপ্রদেশে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। যা রাজ্যের নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই মুহূর্তে প্রায় দশ লাখের কাছাকাছি বাংলাদেশী রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে রয়েছে। পুলিশ প্রশাসনের চোখের সামনেই চলছে অবাধে অনুপ্রবেশের ঘটনা। রাজ্য সরকার সব কিছু জেনেও, অনুপ্রবেশ রোধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। বিরোধীদের অভিযোগ মায়াবতী সরকার মুসলিম ভোট ব্যাঙ্কের লোভেই অনুপ্রবেশে প্রচ্ছন্নভাবে মদত দিচ্ছে। সরকারিভাবে অনুপ্রবেশ রোধে মায়াবতী সরকারের কোনও নতুন কর্মসূচীর কথাও জানা যায়নি। বিগত তিন চার বছরে অনুপ্রবেশের ঘটনা বেড়েছে। সমাজবাদী পার্টির আমলেও রাজ্য সরকার অনুপ্রবেশ নিয়ে মাথা ঘামায়নি। মায়াবতীও সেই পথেই হাঁটছেন। মাঝে মধ্যে প্রশাসন কিছুটা নড়ে চড়ে বসলেও, তা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার তুলনায় কিছু নয়। এর ওপর রয়েছে রাজনৈতিকদলগুলির ভোট ব্যাঙ্কের অঙ্ক। ভোটের সমীকরণ মেলাতে ক্ষমতাসীন দল ও সমাজবাদী পার্টির অনুপ্রবেশে প্রত্যক্ষ মদত রয়েছে। নেতাদের মুখে এ বিষয়ে কোনও রা' নেই।

অনুপ্রবেশের হাত থেকে সুরক্ষিত নয় খোদ রাজধানী শহরও। লক্ষ্ণৌ-এ সর্বত্রই বাংলাদেশীদের প্রভাব বাড়ছে। অনুপ্রবেশকারীদের একটা বড় অংশ লক্ষ্ণৌতে রয়েছে। লক্ষ্ণৌ-র মতো জায়গায় বাংলাদেশীদের বাড়-বাড়ন্তের পরও, পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা হতাশাজনক। প্রতিরোধে আশাব্যঞ্জক কোনও খবর প্রশাসন জানাতে পারেনি। প্রশাসনের নীরবতা ও রাজনৈতিক দলগুলির দাক্ষিণ্যে তাদের একটা বড় অংশের ভোটার কার্ড, রেশন কার্ডও তৈরি হয়ে গেছে। ফলে ভোট ব্যাঙ্কের স্বার্থে তারা এখন বহাল তবিয়তে রয়েছে। ইতিমধ্যেই লক্ষ্ণৌতে রেলের জায়গা দখল করে বসে পড়ছে অনুপ্রবেশকারীরা। তবুও রেল কর্তৃপক্ষ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। কারণ একটাই— ভোট ব্যাঙ্ক। মাঝে মধ্যে বাংলাদেশীদের আস্তানায় তল্লাশি চালানো হলেও, বাংলাদেশীরা নিজেদের অসম ও পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা বলে পরিচয় দেয়। কিন্তু পুলিশ প্রশাসন এতটাই নীরব যে, তারা বাংলাদেশীদের কথাতেই সব করে দেয়, কোনও প্রমাণপত্র চায় না। খোদ লক্ষ্ণৌ শহরেই বাংলাদেশী বস্তি গজিয়ে উঠেছে। লোকসভার ভোটে তারাও একটা ফ্যাক্টর হিসাবে কাজ করেছে। গোয়েন্দা দপ্তর ইতিমধ্যে জানতে পেরেছে প্রায় ১২০ জন ঠিকাদার বাংলাদেশীদের দিয়ে কাজ করাচ্ছে। তারাই ভোটার কার্ডের ব্যবস্থা করে দেয়। যাতে প্রশাসনের হাত থেকে তারা বেঁচে যায়। এই প্রক্রিয়া চলে আসছে দীর্ঘদিন ধরেই। এই ধরনের ঘটনা গোয়েন্দা দপ্তরের হাতেও এসেছে। প্রায় ৪-৫ বার এমন অপারেশনের খবর পাওয়া গিয়েছে। কয়েকদিন আগে এমনই মামলা সামনে আসে। যাতে তিন পাকিস্তানী ও একজন ঢাকার বাসিন্দা ধরা পড়ে। ভোটার লিস্টেও তাদের নাম ছিল। উত্তরপ্রদেশে এই ধরনের ঘটনা দিন দিন বাড়ছে।

বর্তমানে রাজ্যের রাজধানী সহ কুড়ি-পঁচিশটি অঞ্চলে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা মাত্রাতিরিক্ত বেড়েছে। যার মধ্যে রয়েছে বাস আড্ডা, ঠাকুরগঞ্জ, গোমতীনগরের হানীমন চৌরাহা, মতিঝিলি ফাওড্রী, ইন্দিরাপুরম্, সীতাপুর রোড, মন্দিরানগর, সরোজিনীনগর, চীনহট্ট, রাজাজীপুরম, এলডিএ কলোনী, শারদান কলোনী, কৌড়িয়া ঘাট, পাকাপুল, কাকোরী, ত্রিবেণীনগর, হাসানগঞ্জ, গাজীপুর, মনকামেশ্বর, সর্বোদয়নগর, গোলাপবাগসহ

লক্ষ্ণৌ-এ ধৃত বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা।

বিভিন্ন অঞ্চলে।

গত মাসে গ্রেপ্তার হওয়া কবিতা বানু পাকিস্তানের হলেও, বর্তমানে সে উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা — ভোটার কার্ডের সৌজন্যে। এমন অসংখ্য কবিতা বানু রাজ্যের বিভিন্ন জেলায়, অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে। মতিঝিলের জনতা ফাউন্ড্রীর বাসিন্দা আবদুল কুদ্দুসও বর্তমানে উত্তরপ্রদেশের জনতা — নেতাদের দাক্ষিণ্যে। তারও সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র তৈরি হয়ে গেছে। গোপনসূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী রাজধানী শহরেই প্রায় চার লাখ জাল রেশনকার্ড চালু আছে। যাতে বাংলাদেশীদেরও ভাগ রয়েছে। রাজ্য পুলিশের অপরাধ নিয়ন্ত্রক শাখা এই ধরনের রেশন কার্ড বাজেয়াপ্ত করার অনুরোধ জানিয়েছিল। ওই ঘটনায় অভিযুক্ত তৎকালীন জেলা কালেক্টর অনুপ সরকারের সাজা তো হইনি, উল্টে তাঁর পদোন্নতি হয়েছে।

গত ৩০ এপ্রিল লক্ষ্ণৌ-র লোকসভা কেন্দ্রে বাংলাদেশীরা ভোটার হিসাবে ভোটও দেয়। সমাজবাদী, বহুজন সমাজবাদী পার্টি, কংগ্রেস — কোনও দলই এর নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় নয়। তারা নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতেই ব্যস্ত। লক্ষ্ণৌ-র কাছে আলমবাগ বাসস্ট্যান্ড থেকে গত বছর কুখ্যাত এক পাকিস্তানী জঙ্গি ধরা পড়ে। রেলের মালগোদাম কলোনীও এখন বাংলাদেশীদের দখলে। কয়েকদিন আগে উচ্ছেদের আদেশ এলেও, স্থানীয় রেলকর্তৃপক্ষ সাহস করে এগোতে পারেনি। কলোনীর ১০০-রও বেশি ঘরে দিব্যি সুখে দিন কাটাচ্ছে বাংলাদেশীরা। সব সুযোগ সুবিধাও ভোগ করছে তারা। এতসবের পরেও রেল কর্তৃপক্ষ ঠুঁটো জগন্নাথ। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই রেলকর্তৃপক্ষের যোগসাজস থাকারও প্রশ্ন উঠছে। লক্ষ্ণৌ-এর রেলের নিরাপত্তা দপ্তরের আধিকারিক রেণু সিববলকে এবিষয়ে জিজ্ঞাসা করে হলে তিনি বিষয়টি এড়িয়ে যেতে চান। নিজেদের মুখ ঢাকতে বলেন, 'তদন্ত করা হচ্ছে'। এরকম পরিস্থিতি শুধু লক্ষ্ণৌ-র রেল কলোনী বা পার্শ্ববর্তী এলাকার নয়। পুরো উত্তরপ্রদেশ জুড়েই রয়েছে বাংলাদেশীদের বাড় বাড়ন্ত। উত্তরপ্রদেশের মুরাদবাদ, আগরা, রামপুর, ফারুখাবাদ, মীরাট, আলিগড়, কানপুর, বারাণসী, গাজীপুর, ঝাঁসি, মৈনপুরী, গাজিয়াবাদ, গৌতমবুদ্ধ নগর, কনৌজ, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ও ঘনবসতিপূর্ণ জেলাতেও বাংলাদেশীরা নিজেদের জাল বিস্তার করেছে।

গত বছর রাজ্যের পুলিশের মহানির্দেশক বিক্রম সিংহ রাজ্যের সব থানায় এবিষয়ে চিঠি পাঠান। বাংলাদেশী উপদ্রুত এলাকা তল্লাশি চালানোর জন্য। কিন্তু তা শুধুমাত্র লোক দেখানো। বাস্তবে তেমন কিছুই করা হয়নি।

উত্তরপ্রদেশের বাংলাদেশীদের এই বাড়বাড়ন্তে রীতিমতো উদ্বিগ্ন নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা। জঙ্গিদের হামলার ক্ষেত্রে স্থানীয় বাংলাদেশীদের সহযোগিতার সম্ভাবনাও দেখে যাচ্ছে।

দিল্লী সরকারের খামখেয়ালীতে দাম বাড়বে ভোগ্যপণ্যের

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। দিল্লী রাজ্য সরকারের সঙ্গে এবার সরাসরি সঙ্ঘাতের পথে যাচ্ছে দিল্লী পণ্য পরিহনের ছোট গাড়ির মালিকরা।

চার মাস আগে দিল্লীর শীলা দীক্ষিত সরকারের পরিবহন দপ্তর নোটিশ দেয় ওই সব গাড়ির মালিকদের। সেখানে বলা হয়েছিল — জুন, ০৯ এর মধ্যেই ডিজেলের পরিবর্তে গ্যাসে (সি এন জি) ইঞ্জিন বদল করিয়ে নিতে হবে। সময়সীমা পার হতে আর মাত্র একমাস বাকী। কিন্তু হাতে গোণা হালকা পণ্য পরিবহনকারী কয়েকজন গাড়ির মালিকই নির্দেশ পালন করতে পেরেছেন।

গাড়ির মালিকদের বক্তব্য, ওই সরকারি নির্দেশ মানতে হলে তাদেরকে দেড় থেকে দু'লক্ষ টাকা অতিরিক্ত খরচ করতে হবে। অথচ তাতে তাদের সরাসরি কোনও লাভের ব্যাপারই নেই। এখন তো তারা ডিজেলেই দিব্যি গাড়ি চালাচ্ছেন। সেজন্য তাদের পক্ষে সরকারি আদেশ অমান্য করা ছাড়া আর কোনও পথ নেই বলে জানিয়েছেন দিল্লীর হাল্কা পণ্য পরিবাহী গাড়ির মালিকদের সংস্থার সভাপতি অরুণ শর্মা।

দিল্লীতে পণ্য পরিবাহী হাল্কা গাড়ির সংখ্যা ১১ হাজার। ওইসব গাড়িতেই নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্য — যেমন, শাক-সব্জি, দুধ, ফল এবং অন্যান্য দ্রব্য বড় বাজার থেকে খুচরো বিক্রেতাদের মাধ্যমে রোজ উপভোক্তাদের কাছে পৌঁছায়। শর্মাজী আরও জানিয়েছেন, ২০০৬ সালে পরিবহন দপ্তরের সঙ্গে তাঁদের এক চুক্তি হয়েছিল। সেই চুক্তিতে তখন পর্যন্ত ডিজেল চালিত পণ্য পরিবহনকারীদের আর বিরক্ত করা হবে না বলা হয়েছিল। তবে তারপরের তারিখ থেকে নতুন পণ্যবাহী ওইরকম গাড়িতে সি এন জি কিট থাকতে হবে। শ্রীশর্মার কথায় ওই চুক্তি ঠিকমতো কার্যকরী করা হয়নি।

সূত্র মতে ডিজেল চালিত গাড়িতে সি এন জি কিট লাগাতে যেখানে দেড় থেকে দু'লাখ টাকা খরচ, সেখানে নতুন গ্যাস চালিত গাড়ির দাম প্রায় সাড়ে সাত লাখ টাকা। এই দাম ডিজেল চালিত গাড়ির থেকে এক লাখ বেশি। আবার একটি ডিজেল চালিত গাড়ি যেখানে পনের বছর হেসে-খেলে চলে সেক্ষেত্রে সি এন জি গাড়ি খুব জোর মাত্র আট বছর চলে।

সরকার যদি সবাইকে সি এন জি কিট লাগাতে বা নতুন গাড়ি কিনতে বাধ্য করে তাহলে অবধারিতভাবে পরিবহন শুল্ক বাড়বে। আর পরিবহন ব্যয় বাড়লে জিনিসপত্রের দাম বাড়াতে বাধ্য হবে ছোট খুচরো বিক্রেতারা। সেক্ষেত্রে দায়ি হবে দিল্লী রাজ্য সরকারের পরিবহন দপ্তরের খামখেয়ালিপনা।

স্বস্তিকার দাম
প্রতি সংখ্যা - ৪.০০ টাকা
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য
সডাক্ - ২০০.০০ টাকা

কেরলে দেবতাকে নিয়ে ব্যবসার অধিকার চাইছে মন্দির কর্তৃপক্ষ

দেবী কান্নাগি

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। বিশ্বজোড়া আর্থিক মন্দা থেকে উত্তরণের তাগিদে বাণিজ্যিকিকরণের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছেন না স্বয়ং দেবতাও। এরকমই এক গুরুতর অভিযোগে জড়িয়ে পড়েছে কেরলের তিরুঅনন্তপুরমের আত্তুকাল দেবী মন্দির। ওই মন্দিরের দেবী কান্নাগি-কে বাণিজ্যিক ট্রেডমার্ক হিসেবে ব্যবহার করার অভিযোগ উঠেছে মন্দির কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, নারীদের তীর্থক্ষেত্র সাবরিমালাই-এর মতোই জাগ্রত দেবী কান্নাগিকে গত মার্চ মাসের শেষে বাণিজ্যিক ট্রেডমার্ক হিসেবে নথিভুক্ত করানো হয়। এরপর কেরল হাইকোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ওই মন্দির কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে। চাপের মুখে মন্দির কর্তৃপক্ষ জানায় যে তাঁরা দেবীর উপর আইনগতভাবে পেটেন্টজনিত অধিকার বলে এটা করেছেন। প্রশ্ন উঠেছে, আইনগত, নৈতিক এবং ধর্মীয় দিক থেকে দেব-দেবীকে মেধা সম্পত্তি আইনের আওতায় আনা যায় কিনা এবং ট্রেডমার্কের জন্য নথিভুক্ত করা যায় কিনা।

এই প্রশ্ন তুলেই ফ্যাক্স বার্তা পাঠান ৩০ বছর বয়সী ন্যাশন্যাল ইন্সটিটিউট ফর ইন্টারডিসিপ্লিনারী সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির বৈজ্ঞানিক আর এস প্রবীণরাজ। সেই ফ্যাক্স বার্তা গ্রহণ করেই কেরল হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এস আর বান্নুরমাথ এবং বিচারপতি কুরিয়ান যোসেফের ডিভিশন বেঞ্চ এই মামলায় মন্দির কর্তৃপক্ষকে পার্টি করেন। প্রসঙ্গত, দেবী কান্নাগির নামে উৎসর্গীকৃত আত্তাকুল মন্দির। তামিল পুরাণ সিলাপ্পাথিকারাম-এ বর্ণিত রয়েছে তামিলনাড়ুর মাদুরাই-এ দেবীর স্থায়ী বসবাস। একই সঙ্গে তিনি কেরলের কোদুনগালুর মন্দিরেও পূজিত হন। পুরাণ মাহাত্ম্য অনুধাবন করে এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের অনুমান, হঠাৎ আত্তাকুল মন্দির কর্তৃপক্ষ যে কান্ডটি বাধিয়েছেন তা ভবিষ্যতে আরও ঘোঁট পাকাবে।

বইপাড়ার খবরাখবর

বইমেলা শেষ হয়েছে। বইমেলায় কিছু উল্লেখযোগ্য বইও প্রকাশিত হয়েছে। ডঃ বরুণ কুমার চক্রবর্তী ও ডঃ সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'লোকসংস্কৃতি ও নৃবিদ্যার অভিধান' প্রকাশিত হয়েছে অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স থেকে। এই বইটির দাম ৩৫০ টাকা । ঊনিশ শতকের জাতীয় মেলা হিন্দুমেলা, সেই মেলার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছিলেন যোগেশচন্দ্র বাগল। বইটি পুনরায় প্রকাশিত হয়েছে। শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত -যোগেশচন্দ্র বাগল পাওয়া যাচ্ছে কলেজ স্ট্রিটের বিভিন্ন দোকানে। এই বইটির দাম ৩০০ টাকা। ডঃ বৃন্দাবনচন্দ্র কুণ্ডু সম্পাদিত 'বাংলা থিয়েটারের পটভূমি প্রতিষ্ঠা এবং বিকাশ' দুটি খন্ড প্রকাশিত হয়েছে। বইটি পাওয়া যাবে অভিষিক্তা পাবলিকেশন থেকে। বইটির দাম মোট ৪০০ টাকা। শ্রীহাবু পাল রচিত 'ভারতীয় বৈষ্ণবধর্মে শ্রীচৈতন্য ও শাখা সম্প্রদায়' বইটি প্রকাশিত হয়েছে বিশ্ববাণী প্রকাশনী থেকে। এই বইটির দাম ৩২৫ টাকা। পুরাণবর্ণিত গণেশ ঠাকুরের অনেক বৃত্তান্ত আর তাই নিয়ে শিশু সাহিত্য সংসদ থেকে প্রকাশিত হয়েছে হীরেন চট্টোপাধ্যায়ের গণেশ ঠাকুরের গল্প।

বইটির দাম ৭০ টাকা।

পশ্চিমবঙ্গে প্রায় বিয়াল্লিশ হাজার গ্রাম ও শহরের স্থান নামের পেছনে আছে কত না ইতিহাস আর তাই নিয়ে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত হয়েছে সমরেন্দ্রনাথ চন্দ্র রচিত 'গল্পে গাথায় ছন্দে বাংলা স্থান নাম'। এই বইটির দাম ২৫০ টাকা। অমিয় শঙ্কর চৌধুরী রচিত 'মহাকবি কৃত্তিবাসের জন্মের তারিখ' প্রকাশিত হয়েছে পুস্তক বিপণি থেকে। এই বইটির দাম ১০০ টাকা।

বাংলা সাহিত্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিয়ে এমন সম্পূর্ণ উপন্যাস আগে লেখা হয়নি

পুস্তক প্রসঙ্গ

ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ

বাঙালী পাঠক কত বিচিত্র ধরনের বই পড়ে থাকেন; কিন্তু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাভিত্তিক কোনও সম্পূর্ণ উপন্যাস এযাবৎ তাদের হাতে পড়েছে কিনা সন্দেহ। কারণ, বাংলার বুকে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্পর্কে গল্প-উপন্যাস-নাটকে ছিটেফোঁটা উল্লেখ থাকলেও একখানা আস্ত উপন্যাস এযাবৎ রচিত হয়নি বলেই জানি।

১৯৪৬ সালে নোয়াখালি জেলায় হিন্দু বিরোধী দাঙ্গা-ভিত্তিক নীলগ্রীব সিংহ রচিত "সরওয়ারের তলোয়ার" গ্রন্থখানি এক অভিনব প্রকাশন। যে বাংলা ইসলামী সাম্প্রদায়িকতার প্রথম শিকার, সে বাংলার সাহিত্যসেবীরা মানব ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম ঘটনা ও চরম জাতীয় বিপর্যয়কে সযত্নে চোখ বুজে এড়িয়ে গেছেন। অথচ একই ইসলামী বর্বরতার শিকার পাঞ্জাবীরা পাঞ্জাবের দেশবিভাগকালীন রক্তাক্ত ইতিহাস অবলম্বনে কালজয়ী সাহিত্য রচনা করতে পেছপা হয়নি।

যদিও বাংলার বুকে কলকাতা শহরে এবং নোয়াখালির গ্রামাঞ্চলে অনুষ্ঠিত ইসলামী বর্বরতার হাত থেকে রেহাই পেতে দেশভাগের মতো নির্মম সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল, তার কোনও উল্লেখযোগ্য প্রতিফলন কিন্তু বাংলা সাহিত্য শিল্প সঙ্গীত-নাটক-চলচ্চিত্র ইত্যাদিতে পড়েনি। যা নিয়ে মহাকাব্য রচিত হতে পারে, তার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উল্লেখে সত্য উদঘাটনের চেয়ে সত্যকে আড়াল করার অসৎ উদ্দেশ্যই প্রকট। বাংলার বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় উদ্বাস্তুদের দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে কিঞ্চিৎ হাহুতাশ করলেও কেন উদ্বাস্তু হতে হয়েছিল, সে সম্পর্কে নির্বাক। যাদের অত্যাচারে হিন্দুরা দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছিল, সেই অত্যাচারী মুসলমানদের চরিত্র যাতে কোনওমতেই কালিমা লিপ্ত না হয়, সে ব্যাপারে বুদ্ধিজীবী সমাজ নীরব ছিল এবং এখনও আছে, সদা সতর্ক ও একান্ত সাবধান। মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার কথা উঠলেই তাঁরা জোঁকের মুখে নুন পড়ার মতো কুঁকড়ে যান। পেট্রো-ডলারী নিমক খেয়ে কি নিমকহারামি করা যায়?

কিন্তু নীলগ্রীব সিংহ রচিত "সরোয়ারের তলোয়ার" নামক

গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের। ১৯৪৬ সালের ১০ অক্টোবর লক্ষ্মীপূজার দিন থেকে নোয়াখালি জেলার অতি সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর ইসলাম ধর্মের নির্দেশ ও অনুমোদিত সমস্ত রকম বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতা প্রয়োগ করে লীগ নেতা গোলাম সরওয়ারের নেতৃত্বে মুসলিম গুন্ডারা। গুণ্ডার দল হিন্দুদের উপর যেভাবে হামলে পড়েছিল এবং নির্বিচারে লুটপাট, গৃহদাহ, হত্যা, মহিলাদের উপর পাশবিক অত্যাচার, মঠ-মন্দির ধ্বংস সাধন করেছিল;নবাবী ও সুলতানী আমলের পরে তেমনটি আর ঘটেনি। গ্রন্থকার সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত মুসলিম লীগ সরকার ও দলীয় নেতাদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা ও সহায়তায় অনুষ্ঠিত ওইসব বর্বর ও বর্বরতাকে অবলম্বন করে এই উপন্যাস রচনা করেছেন। কলকাতা দাঙ্গা নিয়ে মুখপাত করে তিনি নোয়াখালির দাঙ্গায় গ্রন্থের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন। গ্রন্থখানি জীবন্ত ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলে স্বীকৃতির দাবি করতে পারে।

এই গ্রন্থের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে সেসব নির্মম কাহিনী ও দুষ্কর্মকারীদের অপকীর্তির কথা। আর তার সঙ্গে অত্যাচারিত হিন্দুদের জান-মালের ধ্বংসলীলার সঠিক বিবরণ। যে সমস্ত গ্রাম বাড়ি ও বিশিষ্ট হিন্দু নেতা দাঙ্গাকারীদের রোষানলে দগ্ধ হয়েছিলেন, তারা যেন জীবন্ত হয়ে গ্রন্থের পাতায় উঠে এসেছেন। সে সঙ্গে নরপশু জেহাদী নেতারাও। ঘটনাস্থলের এবং আক্রান্ত ও অত্যাচারিত ব্যক্তিদের ছদ্মনাম ব্যবহৃত হলেও প্রবীণ নোয়াখালিবাসীরা তাদের অনায়াসে চিনতে পারবেন।

অপ্রিয় ও অপ্রকট সত্য প্রকাশে ব্রতী লেখক একটি দুরূহ ও দুঃসাহসী কর্ম সম্পাদন করলেন। সাম্প্রদায়িকতার যূপকাষ্ঠেযাদের বলিদানের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা ভোগ করছি, তাদের কথা মানুষ ভুলে গেছে;কিন্তু গ্রন্থকার তাদের সাহিত্যের পাতায় চিরস্থায়ী আসন দিয়ে গেলেন। তার জন্য কোনও ধন্যবাদ বা অভিনন্দনই যথেষ্ট নয়।

সরওয়ারের তলোয়ার —নীলগ্রীব সিংহ
অমৃতশরণ প্রকাশন , বিদ্যাসাগর রোড
নবপল্লী, কলকাতা-৭০০১২৬, মূল্য : ১৭০ টাকা

ডঃ শ্যামাপ্রসাদের কথা তিনটি প্রজন্মকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে

সাধনানন্দ মিশ্র

আজ থেকে প্রায় ৬০/৭০ বছর আগে ভারতের রাজনৈতিক গগনে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব হয়েছিল, যিনি ভারতের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবাহী হিন্দু জাতিকে ও স্বদেশকে সঠিক রাজনৈতিক দিশায় পরিচালিত করেছিলেন, তিনি হলেন দৃঢ়চেতা পুরুষসিংহ ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ভারত তথা বাঙালী হিন্দুর অবিসম্বাদিত নেতা। আজ সেই মহাপুরুষের কথা আমরা ভুলে গিয়েছি। ১৯৫৩ সালের ২৩ জুন কাশ্মীরে শ্যামাপ্রসাদের আত্মবলিদানের পর আজ ৩টি প্রজন্মকে তাঁর অমর কীর্তি কাহিনীর কথা ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু তাঁর জন্মদিনে তাঁরই অনুগামী কয়েকটি দল ও প্রতিষ্ঠান ছাড়া তাঁর কথা আর কেউ স্মরণ করেন না। অথচ আজ তাঁরই দূরদর্শিতা ও তীব্র আন্দোলনের ফলে পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম লীগ শাসন অর্থাৎ মুসলমান শাসন থেকে রক্ষা পেয়ে বাঙালী হিন্দুদের জন্য 'পশ্চিমবঙ্গ' নামে পৃথক একটি বাসভূমি তৈরি হওয়ার ফলে হিন্দুজাতি যে সম্পূর্ণ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে, একথা ভুলেও কোনও হিন্দু স্মরণ করেন না। বাঙালী হিন্দুর সেই পরিত্রাতা মহাপুরুষকে 'সাম্প্রদায়িক' আখ্যা দিয়ে দেশ ও জাতির থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার নিরলস প্রচেষ্টা এখনও চালিয়ে যাচ্ছেন কংগ্রেস, কম্যুনিস্ট, অবিবেকী কিছু বুদ্ধিজীবী, সংবাদপত্র ও সংবাদমাধ্যম ও মেকী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, মুসলিম ও খৃস্টান তোষণকারীর দল!

'বাঙালীর পরিত্রাতা শ্যামাপ্রসাদ' শীর্ষক আলোচ্য গ্রন্থটিতে লেখক ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ হিন্দুধর্ম, সংস্কৃতি ও প্রকৃত জাতীয়তাবোধের ভিত্তিতে আত্মবিশ্বাসী, দেশপ্রেমী, দুর্জয় হিন্দুজাতি গঠনে শ্যামাপ্রসাদের ভূমিকা ও অবদানের ইতিহাস সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন। কীভাবে বাংলাকে ভাগ করে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠা করে মুসলিম লীগের কবলে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন, তারই ইতিহাস তিনি বর্তমান প্রজন্মের কাছে শুনিয়েছেন। শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর পর থেকে ৩টি প্রজন্ম কেটে গিয়েছে। ভারতের জাতীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শ্যামাপ্রসাদের অবদান সম্পর্কে ৩টি প্রজন্ম কিছুই জানে না বা জানানো হয় না। শ্যামাপ্রসাদের জাতীয় চিন্তাধারা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তিনি যে কী প্রাণপাত পরিশ্রম করেছিলেন এবং শেষে তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু,

কংগ্রেস, কম্যুনিস্ট ও মুসলমানদের ষড়যন্ত্রে কাশ্মীরে তাঁকে শোচনীয়ভাবে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল, সে কথা ক'জন হিন্দুরই বা মনে আছে? অথচ পশ্চিমবঙ্গে যে সব হিন্দু মুসলমানদের দ্বারা অত্যাচারিত ও নির্যাতিত হয়ে পূর্ববঙ্গ থেকে পালিয়ে এসে এখানে সরকার চালাচ্ছেন, বা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁদের আখের গুছিয়ে নিতে পারছেন, তাঁরা এমনই অকৃতজ্ঞ যে, তাঁর কথা তারা ভুলেও উচ্চারণ তো করেনই না, অধিকন্তু কংগ্রেস, কম্যুনিস্ট প্রভৃতি 'সেকুলারিস্ট' দলগুলিতে যেসব হিন্দু রয়েছেন, তাঁরা তাঁকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়ে জাতীয় জীবন থেকে দূরে ব্রাত্য করে রাখবার চেষ্টা করে চলেছেন। এখনকার সংবাদপত্র সংবাদমাধ্যমও শ্যামাপ্রসাদের বিরুদ্ধে এই অপপ্রচারের প্রধান ভূমিকা নিয়েছে। যারা ধর্মের ও দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগ করল, তারা হয়ে গেল 'ধর্মনিরপেক্ষ' 'জাতীয়তাবাদী' — আর যিনি বা যাঁরা এই সর্বনাশা মুসলিম তোষণের বিরোধিতা করে অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠা, হিন্দুধর্ম সংস্কৃতি রক্ষার চেষ্টা করে চলেছেন, তিনি বা তাঁরা হয়ে গেলেন 'সাম্প্রদায়িক'? মুসলিম তোষণের জন্য নিত্য নূতন পরিকল্পনার প্রতিযোগিতা চলছে কীভাবে মুসলমানদের ভোট পাওয়ার জন্য কোন্ দল কতদূর নীচে যেতে পারে? ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে এই নির্লজ্জ সাম্প্রদায়িকতা, দেশদ্রোহিতা ও বিশ্বাসঘাতকতার নামান্তর নয় কি?

ভারতবর্ষ হিন্দুদেরই স্বদেশ ও মাতৃভূমি, যে জন্য হিন্দুরা ভারতকে 'ভারতমাতা' বলে থাকেন ও 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতের মাধ্যমে মাতাকে বন্দনা করেন, এই কারণেই বৃটিশ সরকারের অত্যাচার ও শোষণ থেকে ভারতকে মুক্ত করার জন্য শত শত হিন্দু বিপ্লবী যুবক তাঁদের ত্যাগসমৃদ্ধ জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। এই দুর্দমনীয় হিন্দুশক্তিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে ইংরেজ সরকার ভারতবাসীদের ধর্মীয় বিভাজন করেছিল। তদনুসারে নির্বাচনের মাধ্যমে অবিভক্ত বাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের শাসন প্রবর্তিত হলো। সেই খিলাফৎ আন্দোলনের (১৯২১) সময় থেকেই মুসলিম

(এরপর ৯ পাতায়)

শিক্ষাই মানবিক মূল্যবোধ শেখায় চ্যবন কমিটির সুপারিশ চালু করুক সরকার

জে এস রাজপুত

পরিসংখ্যানের মাধ্যমেই সরকার উন্নয়ণের মাপকাঠি নির্দ্ধারণ করে। শিক্ষার ক্ষেত্রে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধিকে উন্নয়ণের মাপদণ্ড হিসেবে গণ্য করা হয়, সন্দেহ নেই। স্বাধীনতার যুগ থেকে আজ অবধি শিক্ষা প্রসারের আবশ্যকতা অত্যন্ত জরুরি। শিক্ষার হার এদেশে ২০ শতাংশ থেকে ৬৮ শতাংশ হয়েছে গত ছয় দশকে, অথচ জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে তিন গুণেরও বেশি।

অবশ্য এটা বড় প্রাপ্তি। সেই সঙ্গে এটাও বাস্তব যে, স্কুলগুলিতে আজ ৯৬ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী নাম লেখাচ্ছে এবং স্কুলছুটদের সংখ্যার হারও নেমে এসেছে। এটাও সমানভাবে সত্য যে, লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী কিছু না শিখেই পড়া ছেড়ে দিচ্ছে। বিদ্যালয় শিক্ষা থেকে উচ্চতর শিক্ষায় উন্নীত হওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের হার এদেশে এখনও ১০-১২ শতাংশ, যা দুনিয়ার উন্নত দেশগুলির চেয়ে অনেক নীচে। দেশের তরুণ-তরুণীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষত আধুনিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং পরিচালনাসহ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে দেশের নাম উজ্জ্বল করেছে। দু'লক্ষেরও বেশি ছাত্র-ছাত্রী দেশের বাইরে পঠন-পাঠন করছে এবং এইভাবে ভারতীয় মেধা বাইরে চলে যাচ্ছে, অথচ এরা দেশে থাকলে এদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে আরও মজবুত করতে পারত।

যখন সত্যমের কারচুপি জানাজানি হল, তখন শুধু সংস্থার কর্মী বা শেয়ার হোল্ডাররা ক্ষতিগ্রস্ত হন তা নয়, বরং এই ঘটনায় দুনিয়াতে ভারতের বিশ্বাসযোগ্যতা তলানিতে এসে ঠেকল। এই ঘটনা দেশের নৈতিকতাকে প্রবল ধাক্কা দিল। এটা কেবল একটা আর্থিক ইস্যু নয়, এই ঘটনা আমাদের দেশে যে শিক্ষা দেওয়া হয় স্কুল-কলেজগুলিতে সেখানেও তার প্রভাব পড়ল।

১৯৯৮ সালে পঠন-পাঠনের বিষয় কী হবে তা নিয়ে দেশজুড়ে বিতর্ক শুরু হয়েছিল। তারই প্রেক্ষিতে শিক্ষক-শিক্ষণের জাতীয় কর্মশালায় দুটো আলোচনাচক্রে আমার অংশগ্রহণ করার সুযোগ হয়েছিল। সেখানে সমাজের বিভিন্ন অংশ বিশেষত শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক এবং বুদ্ধিজীবী মানুষেরা একটা বিষয়ে একমত হয়েছিলেন। তা হল — 'দেশজুড়ে ব্যাপক নৈতিক অবক্ষয় শুরু হয়েছে, জনজীবনের প্রতিটি স্তরে। শিক্ষাকে এই অবক্ষয় রুখে দিতে সংস্কারের প্রয়োজন।" ১৯৯৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংসদীয় কমিটি মানব উন্নয়ণ বিষয়ে এক রিপোর্ট সংসদের দুই কক্ষে জমা দেয়। তাতে সুপারিশ করা হয় কীভাবে শিক্ষার মাধ্যমে স্কুল, কলেজগুলিতে ছাত্র-ছাত্রীদের নৈতিক মূল্যবোধের উন্নয়ণ করা যায়। এ বিষয়ে যে রিপোর্ট পেশ করা হয়েছিল, তার অনুচ্ছেদ ৮ ও ১৩-তে কী বলা হয়েছে তা একবার উল্লেখ প্রয়োজন।

অনু : ৮। সত্য, ধর্ম, শান্তি, প্রেম এবং অহিংসার মতো বিশ্বজনীন মূল্যবোধগুলিকে চিহ্নিত করে তা নৈতিক শিক্ষার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে শিক্ষার সিলেবাস রচনা করা যেতে পারে। এই পাঁচ সূত্রীয় গুণাবলী বিশ্বজনীন এবং মানুষের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। এর ওপরে দাঁড়িয়ে মানুষের বুদ্ধি মত্তা, শারীরিক, মানসিক অনুভূতি এবং আধ্যাত্মিক সত্ত্বা। এগুলি আবার শিক্ষার মৌলিক শর্তগুলি যেমন, জ্ঞান, মেধা, দর্শনের মতো বিষয়গুলির সঙ্গে সম্পৃক্ত।

অনুঃ ১৩। অপর বিষয় হল ধর্ম। ধর্মের বিষয় যা নিয়ে প্রায়শই বিতর্কের জন্ম দেয় — সে বিষয়েও গুরুত্ব আরোপ জরুরি। এই বিষয়ে স্কুল-শিক্ষার মধ্যপর্যায় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার অঙ্গনে বিভিন্ন ধর্মের মৌলিক দর্শন নিয়ে পড়াশুনা করতে হবে। ছাত্রদের মনে রাখতে হবে যে, প্রতিটি ধর্মের মৌলিক বিষয় এক, কেবল ভিন্ন উপাসনা পদ্ধতি। যদিও বা কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভিন্নতা থেকেও থাকে, তাহলে মানুষকে সহমর্মিতার মধ্যে বাঁচার তত্ত্ব শিখতে হবে এবং শিখতে হবে কোনও ধর্মের বিরুদ্ধে যেন কোনও ঘৃণার সৃষ্টি না হয়।

নীতি-নির্দ্ধারকদের নীতি নির্দ্ধারণের সময়ে কোনও বিষয়ে অন্ধত্ব না রেখে নীতি রচনা করতে হবে। ধর্ম বাস্তব। তবে দেশ ধর্মনিরপেক্ষ বটে, কিন্তু সমাজ ধর্মীয়। তবুও এদের মধ্যে কোনও বিরোধ নেই। যে কেউ মনে করতে পারে যে, প্রকৃত অর্থে ধর্মীয় মানুষই আসলে প্রকৃত ধর্ম নিরপেক্ষ। ভারতীয় ঐতিহ্যে খৃস্টান, ইসলাম, জোরাষ্ট্রীয়ানরা ভারতে এসেছে এবং সমাজ এদের সাদরে গ্রহণ করেছে। শিশুদের ধর্মশিক্ষা গ্রহণে বাধা দান উচিত নয়, কারণ প্রতিটি ধর্মের মধ্যে যে মৌলিকতা রয়েছে তা অভিন্ন এবং যেখানে ভিন্নতা রয়েছে তা দূর করতে সচেষ্ট হতে হবে। একবিংশ শতকের শিক্ষায় মৌলিক শর্তই হল ভিন্নতা ভুলে একসঙ্গে বেঁচে থাকা এবং সমাজজীবনকে আরও সংহত করা। ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা দু'হাজার বছরের প্রাচীন। জগতে যে দাঙ্গা, হিংসা, নিরপরাধদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া, কিংবা ধর্মান্ধতা, অবিশ্বাসকে দূর করতে শিক্ষাই মুখ্য ভূমিকা পালন করার দায়িত্ব নিতে পারে। বিষয়টা যতই জটিল হোক শিক্ষার কেন্দ্রগুলি ছাড়া আর কোনও বিকল্প নেই, যা মানুষকে শান্তি ও সৌহার্দ্যের মধ্যে বাস করার শিক্ষা দিতে পারে।

বর্তমান দুনিয়ায় সবচেয়ে বড় সমস্যা হল ধর্মীয় শান্তিতে বসবাস করা। সুচিন্তিতভাবেই স্কুল-কলেজ শিক্ষার বাইরেও এ বিষয়ে শিক্ষিত করার প্রক্রিয়া চালু হয়েছে। বিশ্ব মেনে নিয়েছে মানুষের কিছু স্বর্গীয় মানবিক মূল্যকে এবং কেউই এর বিরোধিতা করেনি। পন্থা ভিন্ন হলেও এর সারবত্তা একই। চ্যবন কমিটি সত্য, শান্তি, অহিংসা, ধর্ম, প্রেমকে এক সূত্রে গেঁথেছে। এর প্রতিটি অপর চারটির সঙ্গে যুক্ত।

শিক্ষাকে মানতে হবে যে, এইসব গুণাবলী মানবজীবনের প্রতিটি কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত এবং তা কেবলমাত্র শিক্ষাদানের মাধ্যমে করলে চলবে না। সেই সঙ্গে পরিবারগতভাবে অভিভাবকদেরও তাদের সন্তানদের কাছে তুলে ধরতে হবে এই মূল্যবোধগুলিকে। বিভিন্ন নেতা এবং বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদেরও নতুন প্রজন্মের কাছে এই মূল্যবোধগুলিকে তুলে ধরলেই তার প্রভাব অনেক গভীর হয়।

বিশ্বায়নের যুগে বস্তুবাদের কাছে মনে হচ্ছে অধ্যাত্মবাদ হেরে গেছে। এর পরিণাম সমগ্র বিশ্ব চাক্ষুষ করছে এবং আর্থিক উন্নয়ণের স্বপ্ন মুখ থুবড়ে পড়েছে। আবারও একবার দুনিয়ার ঘটনাবলী প্রমাণ করল প্রাচ্যের চিন্তাধারা, আচরণবিধিই সুখ সমৃদ্ধি আনতে পারে, কোনও আর্থিক ঐশ্বর্য বা বস্তুবাদ কখনই তা পারে না। "ধনাদ্ ধর্মম্ তথা সুখম্"। ভারত সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং সত্যের অনুসন্ধানেই জগতে এক বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। সমগ্র বিশ্ব ভারতের দিকে তাকিয়ে রয়েছে শান্তির সুপথ সন্ধানে এবং উন্নততর জীবনযাপনে আধ্যাত্মিক পথের খোঁজে সাহায্য চাইছে। এ বিষয়ে আর্ণল্ড টয়েনবি কী বলেছেন তা দেখা যেতে পারে—

"এটা ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, যে বিষয়গুলি পাশ্চাত্য মতাদর্শে শুরু তার সমাপ্তি ঘটবে ভারতীয় দর্শনের মধ্যে, যদি না অবধারিতভাবে মানবজাতির ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে পরিসমাপ্তি ঘটে। এই মুহূর্তে মানব ইতিহাস ধ্বংসের কিনারায়। এর থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় ভারতীয় দর্শন। সম্রাট অশোক, মহাত্মা গান্ধীর অহিংসার বাণী, ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণের সর্বধর্মসমন্বয় এইসব তত্ত্বের সাহায্যে পরমাণু যুদ্ধের সম্ভাবনার মধ্যেও সমগ্র মানবজাতি সংঘবদ্ধ ভাবে এক পরিবারভুক্ত হিসেবে বাঁচতে পারে। এটাই ধ্বংসের হাত থেকে মুক্তির একমাত্র পন্থা।"

ভারতীয় শিক্ষার বিষয়বস্তু, শিক্ষাপদ্ধতি পুনর্বিন্যাসের সময় এসেছে। এই দিশায় মূল্যভিত্তিক শিক্ষা রূপায়ণই হল প্রাথমিক লক্ষ্য। বৃটিশদের থেকে এদেশে শিক্ষা আমরা যা পেয়েছি তা প্রকৃত বৃটিশ শিক্ষা নয়, বরং এটাকে বলা যায় "বৃটিশ ঔপনিবেশিক শিক্ষা"। আমরা আমাদের শিক্ষা পদ্ধতি রচনা করব স্বামী বিবেকানন্দ, মহর্ষি দয়ানন্দ, মহাত্মা গান্ধী, শ্রী অরবিন্দের মতো মনীষীদের মতাদর্শ থেকে। শ্রী অরবিন্দ দিব্যদর্শনে যা বলেছেন তা উদ্ধৃত করা হল —

"জাতীয় শিক্ষা — এমন শিক্ষা যা বলা যেতে পারে অতীতে শুরু হয়ে বর্তমানে তা চলমান, এমন শিক্ষাই মহান জাতি নির্মাণ করে। যারাই শিক্ষাকে অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চায় তারা আমাদের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। যারা বর্তমান অবস্থার সুযোগ গ্রহণে ব্যর্থ, তা জীবনযুদ্ধে পরাজিত করছে আমাদের। স্মরণাতীত অতীতে ভারতবর্ষে জ্ঞান, চরিত্র ও মহান দর্শনের যে ভাণ্ডার রয়েছে তা সযত্নে সংরক্ষণ করতে হবে। আমরা অবশ্যই ইউরোপের সব ভাল বস্তুকে সংগ্রহ করে ভারতীয় জীবনধারার উপযোগী করে তুলব। আমরা অবশ্যই আধুনিক ও প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থায় মানবিক শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করব যাতে আমরা আত্মনির্ভর হতে পারি। আমরা মানুষ নির্মাণ করব, যন্ত্র নয়।"

শিক্ষা নিয়ে এর থেকে বাস্তবোচিত আর কোনও ব্যাখ্যা থাকতে পারে না এবং এটা এমন এক পদ্ধতি তৈরি করবে যা দেশের তরুণ প্রজন্মকে তৈরি করতে সমর্থ হবে। একমাত্র এমন ধরনের শিক্ষাই ধর্মীয় মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদকে প্রতিহত করতে পারবে। শিক্ষা পদ্ধতি প্রতিনিয়ত পরিবর্তনের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে এমনভাবে প্রস্তুত করবে, যা আগামী দশকগুলিতে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই পরিবর্তনকে বুঝতে ও সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে এবং সেই সঙ্গে দিশা দর্শন করাতেও তারা যথেষ্ট যোগ্য ও সমর্থ হয়।

(লেখক এন সি ই আর টি-এর প্রাক্তন ডিরেক্টর)।

শ্যামাপ্রসাদের কথা ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে

(৫ পাতার পর)

তোষণনীতি চালিয়েছিল কংগ্রেস। ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব ও কংগ্রেসের তাতে সমর্থন — কংগ্রেসের মুসলিম তোষণেরই নীট ফল। কংগ্রেস দেশবিভাগ চায় না — একথা বাইরে প্রচার করলেও মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্থাৎ কোনও কোনও মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলের ভারত থেকে বেরিয়ে যাওয়ার অধিকার (প্রকারান্তরে খন্ডিত ভারত) কংগ্রেস স্বীকার করে নিল। ফলে, দেশবিভাগ অনিবার্য হয়ে উঠলো। এই বিভাজনকে আরও ত্বরান্বিত করবার জন্য মুসলিম লীগ পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায় দাঙ্গা বাধিয়ে হাজার হাজার হিন্দু হত্যা, হিন্দু নারী ধর্ষণ ও ধর্মান্তরিত করলো। ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট কলকাতায় হলো ভয়াবহ হিন্দু হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, নোয়াখালিতেও হলো তাই। কংগ্রেস হিন্দুদের ভোটে জিতেও তাদের রক্ষা করার জন্য এগিয়ে এলো না বা এর বিরুদ্ধে কোনও প্রতিবাদ বা আপত্তিই তুললো না। এই সময় হিন্দু মহাসভার সভাপতিরূপে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ সারা দেশে এই অত্যাচারের প্রতিবাদে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন।

শ্যামাপ্রসাদ যখন দেখলেন যে, গোটা বঙ্গদেশটাই পাকিস্তানের মধ্যে ঢুকে যেতে বসেছে, তখন তিনি বঙ্গদেশকে দু'ভাগ করার আহ্বান জানালেন। তিনি বললেন, যে যুক্তিতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হতে চলেছে, সেই যুক্তিতে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে হিন্দুদের নিজস্ব বাসভূমি তৈরি করা যাবে না কেন? হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল পূর্ব-পাকিস্তানের মধ্যে থাকবে কোন্ যুক্তিতে? অতএব হিন্দু প্রধান পাঞ্জাবের পূর্ব অংশ ও বাংলার পশ্চিম অংশ পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করা হোক। এইভাবে সারা ভারতে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুললেন তিনি। এদিকে কম্যুনিস্টরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পক্ষে প্রচার চালিয়ে গোটা বাংলা ও বিহার, অসমের কিছু অঞ্চল নিয়ে মুসলিম লীগের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এক স্বাধীন বাংলাদেশের (মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ) প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলো। শ্যামাপ্রসাদের তীব্র আন্দোলনের ফলে পশ্চিমবঙ্গকে পাকিস্তান (পূর্ববঙ্গ) থেকে আলাদা করে ভারতের মধ্যে জুড়ে দেওয়ার প্রস্তাব স্বীকার করতে বাধ্য হলো ইংরেজ সরকার। শ্যামাপ্রসাদ বলেছিলেন, 'কংগ্রেস ভারত ভাগ করেছে, আমি পাকিস্তানকে ভাগ করেছি।'

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় তিন বছর মন্ত্রী থাকার পর হিন্দু বিরোধী নেহরু-লিয়াকৎ আলি চুক্তির প্রতিবাদে তিনি মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করলেন। 'জনসঙ্ঘ' নামে একটি সর্বভারতীয় জাতীয় রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করলেন যা বর্তমান ভারতীয় জনতা পার্টি বা বিজেপি। ১৯৫২ সালের নির্বাচনে কলকাতা দক্ষিণ কেন্দ্র থেকে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হলেন। সেই সময় তিনি সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে যে সব জাতীয় ভাবধারাভিত্তিক ভাষণ দিয়েছিলেন, তা ভুলবার নয়। সে সময় দেখেছি, সুদক্ষ পার্লামেন্টিরিয়ান হিসাবে তিনি নেহরু ও তার নীতিকে পার্লামেন্টে তাঁর অকাট্য যুক্তির দ্বারা তুলোধুনা করছেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে ও হিন্দুদের মুসলিম নেক্‌ড়েদের মুখে নিক্ষেপ করার জন্য নেহরু, কংগ্রেস ও কম্যুনিস্টদের দায়ি করছেন তাঁর জোরালো অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে। ভারতভাগের পর তিনি Exchange of Population-এর প্রস্তাব করেছিলেন অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা পশ্চিমবঙ্গে চলে আসুক ও পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরা পূর্ববঙ্গে চলে যাক্। নেহরুর আপত্তিতে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। গৃহীত হলে বর্তমান মুসলিম অনুপ্রবেশ সমস্যা এমন ভয়ঙ্কর হতো না বা মুসলমানদের এতো সংখ্যাবৃদ্ধি হতো না।

আজ ভারতবর্ষের ইতিহাসের এই চরমতম সঙ্কট মুহূর্তে যখন দেখি, হিন্দু নামধারী কয়েকটি ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক গোষ্ঠী হিন্দুর ভোটে জিতে সেই হিন্দুকেই পেছন থেকে ছুরিকাঘাত করে রাষ্ট্রবিরোধী ইসলাম ও খৃস্টান শক্তির হাতে দেশকে উপঢৌকন দিতে অতিমাত্রায় ব্যগ্র হয়ে উঠেছে, ভারতরাষ্ট্র ভিতরে বাইরে আক্রান্ত, হিন্দু সংগঠনগুলির উপর সাম্প্রদায়িক তকমা লাগিয়ে তাদের নির্যাতন করা হচ্ছে, সংবাদপত্র ও সংবাদমাধ্যমগুলির হিন্দু বিরোধী ও রাষ্ট্রবিরোধী প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে, তখন শ্যামাপ্রসাদের মতো একজন বলিষ্ঠ রাজনৈতিক নেতার উপস্থিতির কথা বড় বেশি করে মনে পড়ে। যখন দেখি, যে বিশ্ববিদ্যাতীর্থ প্রাঙ্গণে শুভ শঙ্খধ্বনিতে ভরে উঠতো, সেখানে এখন চলেছে অশিক্ষা, কুশিক্ষা, অপসংস্কৃতির ব্যবসায়ী রাজনৈতিক স্তাবকদের পৈশাচিক নৃত্য, তখন শ্যামাপ্রসাদের মতো দূরদর্শী, বিচক্ষণ, বিদগ্ধ মনীষীর কথা বিশেষ করে মনে পড়ে। ডঃ সিংহের লেখা এই স্বল্পমূল্যের গ্রন্থখানি আধুনিক প্রজন্মের যুবকদের শ্যামাপ্রসাদ সম্পর্কে প্রাথমিকভাবে জানতে বিশেষ সাহায্য করবে ও তাদের স্বদেশীভাবে অনুপ্রাণিত করবে। বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

বাঙালীর পরিত্রাতা শ্যামাপ্রসাদ :
লেখক ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ, প্রকাশকঃ অরুণ ঘোষ, প্রাপ্তিস্থান — বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র, ডঃ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩, মূল্য ৫০ টাকা মাত্র।

পদত্যাগের নাটক

বহু প্রতীক্ষিত পঞ্চ দশ লোকসভা নির্বাচন শেষ হল এবং জনমত প্রকাশ পেল। বিরোধী রাজনৈতিক নেত্রীর উদ্দেশ্যে নোংরা কথা বলা, অশালীন উক্তি করা, পোশাকে ভদ্র মনে হলেও সেই সব অভদ্র ব্যক্তিগণের বর্তমান বক্তব্য সংবাদপত্রে আশার ছবি (জনগণের রায় মেনে নিতেই হবে। এবার আর বলেননি যে মানুষ ভুল করেছে। আর চিন্তায় মাথায় হাত দেওয়া ছবি) দেখে বড়ই করুণা হচ্ছে। সুন্দরবনের বাঘ আজ বাড়ির পোষা মিনি বিড়ালে পরিণত হয়েছে। মমতার মতো আমারও ব্যক্তিগত অনুরোধ ওদের বর্তমানে বিরক্ত না করাই ভালো। হাজার হলেও বানপ্রস্থের সময় আঘাত দেওয়া উচিৎ নয়। যদিও ভদ্রলোকেদের সাথে ভদ্রলোকের মতো চুক্তি হওয়া উচিৎ তবুও...।

এবার আসা যাক এরূপ পতন হল কি করে? অনেকে বলছেন বুদ্ধ দেববাবু যেখানেই মিটিং করতে গিয়েছেন, সেখানেই সিপিএম হেরেছে। তাহলে তো আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বুদ্ধ দেববাবু ফুটবলারদের মতো খেপ খেলতে শুরু করবেন এবং মোটা টাকার বিনিময়ে সিপিএম বিরোধী সব রাজনৈতিক দলই চাইবে তাদের প্রার্থীর হয়ে বুদ্ধ দেববাবু জনসভা, প্রচার করুক — তাহলে সিপিএম হারবেই। এবার বুদ্ধ দেববাবু বুঝুন কোন দলের কাছে কত নেবেন? সেটা ব্যক্তিগত ব্যাপার।

আবার অনেকে বলছে সিপিএমের গোহারার পিছনে কারাত সাহেব। আমরা জানতাম সিপিএম-এর সকলে দলের হয়ে কাজ করে, ওই দলে ব্যক্তির কোনও প্রাধান্য নেই, কিন্তু কারাতের জন্য পরমাণু চুক্তির বিরোধিতা করা, সমর্থন তোলা, তৃতীয় ফ্রন্ট গড়া সবই প্রাধান্য পেয়েছে। সুতরাং পদত্যাগ করা উচিৎ কারাতের সাথে সাথে বুদ্ধ দেববাবুরও। কিন্তু অর্বাচনীরা বলছে, সিপিএম পদত্যাগের কথা হয়তো বিস্মৃত হয়ে গেছে, সিপিএম দেহত্যাগের পূর্বে পদত্যাগ করে না। সুতরাং বুদ্ধ বাবু যে বলেছেন পদত্যাগ করবেন ওটা কথার কথা, কখনই বাস্তব রূপ পাবে না। উনি নাটক করছেন।

এবং প্রমাণ হল — পদত্যাগটা নাটকই।

দেবপ্রসাদ সরকার, মেমারি, বর্ধমান।

মিথ্যা ইতিহাস চর্চা

কটি প্রদেশে পিস্তল গুঁজে ইতিহাসের রণাঙ্গণ সমরে নেমে পড়েন কলকাতাস্থ লালবাজারের পুলিশ কমিশনার স্বয়ং। টিপু সুলতান মসজিদের শাহী ইমাম নূর রহমান বরকতি যে সময়ে তসলিমা নাসরিনের মৃত্যু পরোয়ানা জারি করেন, সেই সময়ে এই কমিশনারবাবুরা ছিলেন পশ্চিম-বঙ্গীয় সরকারের নির্দেশে নীরব দর্শক। অথচ ওই নূর রহমান বরকতিকে পাল্টা চ্যালেঞ্জ জানানো মাত্রই লালবাজারের পুলিশ কমিশনার চুঁচুড়ার পুলিশ সুপারকে লিখে পাঠিয়েছেন যেন 'নেসেসারি অ্যাকশান' নেওয়া হয়। অর্থাৎ আমাকে দড়ি কাছি দিয়ে বেঁধে জেলখানাতে আটক করা হয়, যেমনটি করা হয়েছিল ১৯৯৫ সালে।

কি ওই চ্যালেঞ্জে? আমি প্রথমে ফুরফুরা শরীফের ত্বহা সিদ্দিকী পীরজাদাকে এবং পরে ওই শাহী ইমামকে লিখিতভাবে জানিয়েছিলাম আপনাদের মক্কা শরীফ ও ইসমাইল কুরবানীর কাহিনী, যা কুরাণে লিখিত আছে তা যে সত্য ইহা প্রমাণ করুন (ইহুদী ও খৃস্টানদের পাক কিতাব কথিত ইসহাক কুরবানী-র কাহিনী ছিঁড়ে) অন্যথায় তসলিমার পা ধরে ক্ষমা চান। ব্যাস, এতেই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেছেন কমিশনার বাবু। আমাদের দেশে একটা মিথ্যে ইতিহাস পড়ানো হচ্ছে, মিথ্যে ইতিহাসকে আশ্রয় করে হজযাত্রা চলছে, ওই হজ যাত্রার পেছনে কয়েক শত কোটি টাকা অনুদান তথা অপচয় চলছে, আমি তা বলতে লিখতে পারবো না? মিথ্যে কথাকে নীরবে হজম করতে হবে? যে দেশে কথার স্বাধীনতা নেই, সেই দেশের নাগরিকদের স্বাধীন নাগরিক বলা যায় না। তা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ সপ্তম শ্রেণীর ইতিহাস বইতে লিখেছে "মক্কার কাবা মন্দিরে বহু দেবদেবী ও একটি কালো পাথর ছিল।" মধ্যশিক্ষা পর্ষদের এই এক কথাতেই কুরান অপবিত্র হয়েছে। কেননা, পর্ষদ কুরান কথিত মক্কার ইতিহাস ও ইসমাইল কুরবানীর ইতিহাস অস্বীকার করায় কুরান অবমাননায় বাকী রইল কি? এমতাবস্থায় রাজ্য সরকার মোল্লাদের মহাশত্রু অবশ্যই। এ ছাড়াও ওই কুরবানীর ইতিহাসের বিরুদ্ধ ইতিহাস রয়েছে ইহুদী ও খৃস্টীয় গ্রন্থে, যা মৎপ্রাণীত'মক্কা কান্ড লণ্ড ভন্ড' বইতে আমি উল্লেখ করায় হুগলী কারাগারে আমাকে থাকতে হয়েছে এবং এগারো বছর মামলা চালিয়ে তবেই জিততে হয়েছে।

কথা সত্য পীরজাদা ত্বহা সিদ্দিকী এবং শাহী ইমাম নূর রহমান বরকতি আমার ওই চ্যালেঞ্জের প্রত্যুত্তর পাঠাননি। অর্থাৎ প্রমাণ হয়ে গেল তারা পরাজিত। এই প্রসঙ্গে পত্র লিখে এশিয়াটিক সোসাইটি ও ইতিহাস সংসদের কাছে থেকে কোনও উত্তর পাইনি।

লালবাজারের কমিশনারকে জানাই, আমাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে সুপ্রীম কোর্ট কিংবা হাইকোর্টে পেশ করা কঠিন কিছু নয়। কিন্তু মাননীয় জর্জ সাহেবরা আইন বিশেষজ্ঞ মাত্র, ইতিহাস বিশেষজ্ঞ না হওয়ায় আমার বিচার করবেন কেন? পুলিশ কমিশনার আদালতে বিচার প্রার্থনা করলে তথায় আমিও সুবিচার প্রার্থনা করবই করব। তখন কিন্তু ভারত সরকারকে অবশ্য প্রমাণ করতেই হবে কুরান কথিত মক্কার ইতিহাস এবং ইব্রাহিম কর্তৃক ইসমাইল কুরবানীর কাহিনী সত্য এবং ইহুদী দাবির তথা খৃস্টীয় বাইবেলে বর্ণিত ইসহাক কুরবানির কাহিনী ডাহা মিথ্যা। অন্যথায় ভারত সরকারকে হজ অনুদান তো দূরের কথা, হজযাত্রা-ই নিষিদ্ধ করতে হবে। আমি এই ভারতের এক নম্বর কাফের। ধর্মনিরপেক্ষতার দোহাই দিয়ে মিথ্যে ইতিহাস চর্চা আমার ভারতবর্ষে চলবে না। ধর্মকে অগ্নিশুদ্ধ হতেই হবে। কিন্তু ইসলামের সে ক্ষমতা নেই। শাহী ইমাম মীরজাদা ইদ্রিশ আলিদের উল্লম্ফন চিরতরে ধরাশায়ী। সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের কমরেড সরকার পালায় কোন্ রাস্তায় সেটাও দেখতে বাকী রইল ভারতের তাবৎ হিন্দুদের।

মৃণাল হোড়, হুগলি টাইমস, গুঁইবাগান, সুরের পুকুর, চন্দননগর, হুগলী।

হিন্দুর হিম্মৎ

জওহরলাল এবং জিন্না হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান ভাগাভাগি করিয়াছিল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের দাবিতে এবং কমিউনিস্ট দলের মদতে। বৃটিশের কুচক্রে হিন্দুস্থান এবং পাকিস্তান করিয়াছিল। কমিউনিস্ট দল ছিল বৃটিশের বামহস্ত। কংগ্রেস দল ছিল দক্ষিণ হস্ত। ভারতের অংশ কংগ্রেসের হাতে হস্তান্তর করিয়াছে। পাকিস্তানের অংশ মুসলীম লীগকে দিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছে ১৯৪৭ সালে ১৪ আগস্ট। মহম্মদ আলী জিন্না স্বাধীন পাকিস্তান ইসলাম রাষ্ট্র ঘোষণা করিয়াছে। ওই ১৫ আগস্ট ভারত হস্তান্তর করিয়াছে। স্বাধীনতার নামে কংগ্রেস দলের জওহরলালজী ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছে, হিন্দুরাষ্ট্র বলে ঘোষণা করে নাই। কমিউনিস্ট দলকে কোনও পদ না দেওয়াতেতাহারা মনের দুঃখে বলিয়াছিল 'এ আজাদি ঝুটা হায়'।

তাহারপর ১৯৪৮ সালে ২১ জুন স্বাধীন বা হস্তান্তরিত ভারতের একজন গভর্নর নিযুক্ত করা হল। তিনি চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী। বৃটিশের এবং অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর পৃষ্ঠপোষক। তিনি প্রথম গভর্নর পদ গ্রহণ করিবার সময় যে শপথ বাক্য পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উল্লেখ করিলাম —

"আমি চক্রবর্তী রাজাগোপাল আচারিয়া যথাবিধি প্রতিজ্ঞা করছি যে আমি ষষ্ঠ জর্জ তার বংশধর এবং উত্তরাধিকারীদের প্রতি আইনুসারে বিশ্বস্ত ও অনুগত থাকিব এবং আমি চক্রবর্তী রাজাগোপাল আচারিয়া শপথ নিচ্ছি যে আমি গভর্নর জেনারেলের পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ ও তার বংশধর এবং উত্তরাধিকারীদের সুচারু ও যথাযথভাবে সেবা করিব। (ফ্রীডম অফ ইন্ডিয়া এ, হোকস এবং আমি সুভাষ বলছি শৈলেশ দে, ৪৯২ পাতা)।

ভারতের গভর্নর পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ তার বংশধরকে এবং উত্তরাধিকারীদের সুচারু ভাবে সেবা যত্ন করিবে কেন? তাহাদের বংশধর এবং উত্তরাধিকারী কাহারা? স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগে কিনা? চিন্তা করুন ভারতের প্রথম গভর্নর এইরূপ সর্বনাশা শপথ বাক্যটি কোনও রাজনীতিক দলই বর্তমান জনগণের মধ্যে প্রকাশ এবং প্রতিকারের জন্য উদ্যোগ নেয় নাই কেন? শুধু ভোট আর এম পি, মন্ত্রীর পদলোভে? অর্থের লোভে?

চণ্ডীপ্রসাদ চক্রবর্তী, নর্থবঙ্গাইগাঁও, অসম।

শ্যামল পাল আর নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক শ্যামল পাল পরলোক গমন করেছেন। গত ২৫ মে রাত্রিতে কলকাতায় বিশুদ্ধানন্দ মারোয়াড়ী হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বেশ কিছুদিন ধরেই তিনি অসুস্থ ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৪৮ বৎসর। তাঁর পরিবারের সকলেই সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত।

কোচবিহারে ১৯৬১ সালের ১৩ নভেম্বর তাঁর জন্ম। পিতা গৌরলাল পাল। ছোটবেলায় শ্যামল তাঁর মা'কে হারান। কাকিমা'র কাছেই তিনি মানুষ হন। তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ভালো ফুটবল খেলোয়াড় হিসাবে পাড়ায় তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল। মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করার পর বিদ্যার্থী বিস্তারক হিসাবে তিনি সঙ্ঘের কাজের প্রসারে ব্রতী হন। পরে স্নাতক হওয়ার পর স্বদেশ ও সমাজের সেবায় সঙ্ঘের প্রচারক হিসেবে আত্মোৎসর্গ করেন। তিনি প্রতিজ্ঞা মতো আমৃত্যু এই ব্রত পালন করে গেছেন।

প্রচারক হিসাবে তিনি সঙ্ঘের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। উত্তর দিনাজপুরে সঙ্ঘের জেলা প্রচারক ছিলেন। পরে বিজেপি-র কাজে যোগ দেন। ইদানীং বিজেপি-র জলপাইগুড়ি বিভাগের সংগঠন সম্পাদক ছিলেন। কর্মী নির্মাণে তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতা ছিল প্রশংসনীয়। তাঁর অকাল প্রয়াণে সঙ্ঘ পরিবার শোকাহত।

অমৃতলোকে সঙ্ঘচালক কমল কুমার মণ্ডল

সর্বস্তরের পল্লীবাসী এবং স্বয়ংসেবকদের উদাত্ত মিলিত কণ্ঠে উপনিষদের শ্লোক উচ্চারিত হচ্ছিল পুষ্প স্তবকে স্তবকে সজ্জিত একটি দেহকে বৃত্তাকারে ঘিরে। ধ্বনিত হচ্ছিল সেই শ্লোক : পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাশিষ্যতে। কলকাতা দক্ষিণ বিভাগের

সহ-কার্যবাহ প্রশান্ত চৌধুরীর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে গাইছিল এই মন্ত্র অশ্রুসিক্ত নয়নে পল্লীর আবাল বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, বালক কিশোর শিশুরা তাদের প্রিয় কমল দাদুকে ঘিরে। স্বয়ংসেবকরা তাঁরই বাগানে ফোটা অজস্র বেলফুল ছড়িয়ে দিচ্ছিল তাঁদের কমল দাদুর ঋজু শুভ্রকান্তি সঙ্ঘগত প্রাণ শরীরে। কমল কুমার মন্ডল ইহজগতের সব বন্ধন ছিন্ন করে ২৬ মে খুব ভোরে সকলের অগোচরে নিদ্রামগ্ন অবস্থায় অমরধামে যাত্রা করলেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতা দক্ষিণ ভাগের অন্তর্গত চৈতন্য নগরের সঙ্ঘচালকের গুরুদায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল। যৌবনে নামকরা ফুটবল খেলোয়াড় হিসাবে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। জীবনবীমা কর্পোরেশন-এ চাকুরীরত দিনগুলিতে তিনি ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত ন্যাশানাল অর্গানাইজেশন অব ইন্সিওরেন্স ওয়ার্কার্সের কলকাতা ডিভিশনের সহ-সম্পাদককের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। সঙ্ঘজীবন শুরু হয় নবীনপুর (নিউ আলিপুর) শাখার স্বয়ংসেবক হিসাবে। সঙ্ঘই ছিল তাঁর ধ্যান জ্ঞান। সঙ্ঘময় ছিল তাঁর জীবন — কথাটা বললে এতটুকু বাড়িয়ে বলা হয় না। রবীন্দ্র সরোবর থেকে ছোট রাসবাড়ি পর্যন্ত বিস্তৃত এই বিশাল বস্তি অধ্যুষিত এলাকায় তাঁর যে কী অসীম প্রভাব ছিল তা অনুভূত হল তাঁর মৃত্যু সংবাদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার পর স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে শোকার্ত মানুষের ঢল দেখে। পত্নীর দেহাবসানের পর পল্লীর ছাত্রদের মাধ্যমিকস্তর পর্যন্ত বিনা বেতনে কোচিং ক্লাস শুরু করেছিলেন। নজরকাড়া ফল করত কোচিং ক্লাসের ছেলেরা। কমলদা সেবা ভারতীর সহযোগিতায় ছোটরাসবাড়ি মন্দিরে একটি দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। এছাড়াও নানা সমাজসেবামূলক কাজে তিনি জড়িত ছিলেন। বহু সংখ্যক পল্লীবাসী ও স্বয়ংসেবকরা সুশৃঙ্খলভাবে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে গিয়েছিলেন। কলকাতা মহানগরের সঙ্ঘচালক বিশ্বনাথ মুখার্জি, কলকাতা দক্ষিণ ভাগের সঙ্ঘচালক অসীম গাঙ্গুলী এবং কমলদার ভ্রাতুষ্পুত্র তপন কুমার মন্ডল, সংঘের কলকাতার সহ-সেবা প্রমুখ রঞ্জন ভুঁইয়া, প্রান্ত প্রচার প্রমুখ সুব্রত চট্টোপাধ্যায়, অতি দক্ষিণ ভাগের কার্যবাহ অচ্যুৎ গাঙ্গুলী ও জামাতা তন্ময় ঘোষ ছাড়াও বহু বিশিষ্ট মানুষ অন্তিম যাত্রায় অংশ নেন। সঙ্ঘ নিবেদিত এই একনিষ্ঠ দেশসেবকের প্রয়াণে পল্লীতে শোকের ছায়া নেমে আসে। ৭১ বছরের অদম্য সমাজসেবী রেখে গেছেন একমাত্র কন্যা, জামাতা ও কিশোর নাতিকে। ৬ জুন তার প্রয়াত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য এক স্মরণসভার আয়োজন করা হয়েছে।

পরলোকে শিবাজী দত্ত

তারকেশ্বর (হুগলি) জেলার দ্বারহাট্টা গ্রামের স্বয়ংসেবক শিবাজী দত্ত গত ২২ মে পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৫২ বছর। তিনি স্ত্রী ও এক পুত্র (৬ বছর) রেখে যান। সঙ্ঘের হরিপাল ও জঙ্গিপাড়া খণ্ডের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। তারকেশ্বর জেলার সেবাপ্রমুখের দায়িত্বও তিনি পালন করেছিলেন। একসময় বিজেপি রাজ্য যুবমোর্চার সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বভার তাঁর উপর ছিল। এছাড়াও বিজেপি-র কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক হিসেবে ২০০৪-এর নির্বাচনের প্রাক্কালে আন্দামান গিয়েছিলেন। অযোধ্যায় রামশিলা কার্যক্রম এবং জম্মু-কাশ্মীরের আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা ছিল তাঁর।

১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থায় তিনি কারাবরণ করেছেন। তাঁর মরদেহে সঙ্ঘের স্থানীয় শাখার স্বয়ংসেবক ও কার্যকর্তারা মাল্যার্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বিজেপি-স্থানীয় শাখার কর্মীরাও মাল্যার্পণ করেন। বৈদ্যবাটিতে গঙ্গার ধারে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

সমাবেশ সমাচার

কেশব স্মৃতিতে বিংশতিতম রক্তদান শিবির

সম্প্রতি কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী স্মৃতি রক্ষা সমিতির পরিচালনায় এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলেন্টারি ব্লাড ডোনার্স ফোরামের সহযোগিতায় কেশব স্মৃতি কার্যালয়ে বিংশ তিতম স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। তিনজন মহিলাসহ মোট ৫২ জন রক্তদাতা এই শিবিরে রক্তদান করেছেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রক্তদান ও রক্তের ব্যবহার সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন হাওড়া মহানগর সংঘচালক ডাঃ সুধীর কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, স্থানীয় চিকিৎসক ডাঃ সব্যসাচী দত্ত, কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী স্মৃতি রক্ষা সমিতির সাধারণ সম্পাদক স্বপন নাগ প্রমুখ। এরপর ডাঃ সব্যসাচী গুপ্ত প্রথম রক্তদান করে রক্তদান অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। এই অনুষ্ঠান চলে প্রায় দুপুর ১ টা পর্যন্ত। সকল রক্তদাতাই স্বেচ্ছায় ও আনন্দ সহকারে রক্ত দানের জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

সকল রক্তদাতা ও উপস্থিত সক্রিয় ব্যক্তি বর্গের সহযোগিতা ছাড়া এই অনুষ্ঠানে কখনই সাফল্যমন্ডিত হতে পারতো না। কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী স্মৃতি-রক্ষা সমিতির পক্ষ থেকে তাদের ধন্যবাদ জানানো হয়।

পরম্পরা

জগন্নাথদেবের কেন গণপতি বেশ স্নানযাত্রায়

।। বৈদেহীনন্দন রায়।।

শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথ আর তাঁর বিশাল সুরম্য মন্দির চিরকালই রহস্যময়। কলির এই প্রত্যক্ষ বাসুদেব কতভাবে যে ভক্ত সঙ্গে লীলা করেন — কতভাবে অলক্ষ্য কৃপাবর্ষণ করেন তা বলে শেষ করা যায় না। কলির এই মোক্ষদাতার বহুমুখী লীলা কখনও ঘটে প্রকাশ্যে, কখনও গোপনে। এমনকী সারা বছর ধরে অনুষ্ঠিত যে দ্বাদশ যাত্রা, তার মধ্যে ঘটে যায় নানা অলৌকিক লীলা। কোনও কোনও ভাগ্যবান তা প্রত্যক্ষ করে থাকেন।

সনাতন হিন্দু শাস্ত্রে জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা, স্নান-পূর্ণিমা নামে অভিহিত। প্রেক্ষাপটে আছে তিথি তত্ত্বের একটি শ্লোক — মাসি জ্যৈষ্ঠেতু সংপ্রাপ্তে নক্ষত্রে শক্র দৈবতে। পৌনমাস্যাং আর্দ্রস্নানং সর্ব পাপং হরে দ্বিজা।

দেবস্নান পূর্ণিমায় বিভিন্ন দেবালয়ে দেববিগ্রহের জলাভিষেক বা প্রত্যক্ষ স্নান একটি আবিশ্যিক বিধি। কিন্তু বর্ণময়তায়, গাম্ভীর্যে, মাধুর্যে , বৈভবে পুরীর জগন্নাথ দেবের স্নানপর্বটি অতুলনীয়। আবার রহস্যময়ও বটে। সেদিন জগন্নাথ, সুভদ্রা, বলরাম ও সুদর্শন সহ চতুর্বিগ্রহকে মন্দিরের অন্তঃপ্রাচীর তথা কূর্মবেধ প্রাচীরের কাছে পাহুন্ডি সহকারে আনা হয় এবং সেখানে স্নানমন্ডপের ওপর বসান হয়। তারপর ১০৮ কলসের মন্ত্রপূত জলে বৈদিক মন্ত্র সহকারে স্নান করানো হয়।

স্কন্দপুরাণের পুরুষোত্তম মাহাত্ম্যের ২৯ অধ্যায়ে দেখা যায় পুরুষোত্তম ভগবান রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে বলছেন, তোমার তৈরি এই দেবালয়ে ব্রহ্মার পরার্ধ (এক কল্প) পর্যন্ত অবস্থান করব। জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা আমার ধরাধামে মহাপ্রকাশ কাল। ওইদিন আমাদের চার বিগ্রহকে মহাস্নান বিধি অনুসারে মহাসমারোহে স্নান করাবে। যারা ওই স্নানযাত্রা দর্শন করবে, তারা সর্বপ্রকার তীর্থস্নান, যজ্ঞানুষ্ঠান ও দানের ফললাভ করবে।

স্কন্দপুরাণে পুরুষোত্তম মাহাত্ম্যে বলা হয়েছে জগন্নাথদেব রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে নির্দেশ দিয়েছিলেন স্নানের জল সংগ্রহ হবে মন্দিরের উত্তরভাগে অবস্থিত সূনা কুয়া হতে। কুয়াটি বর্তমানে শীতলা মন্দির সংলগ্ন। বছরে একবার অর্থাৎ স্নান যাত্রার দিন ওই কুয়ার জল ব্যবহার করা হয়।

স্নানান্তে নীলাচলাধিপতি সেদিন ধারণ করেন গণপতিবেশ। কিন্তু কেন তিনি এই বেশ সেদিন ধারণ করেন, তার প্রেক্ষাপটে আছে একটি বহুচর্চিত কাহিনী।

একবার কর্ণাটকের কানিগ্রাম থেকে কষ্টসাধ্য পথ অতিক্রম করে শ্রীক্ষেত্রে এলেন এক ব্রাহ্মণ, গণপতি ভট্ট । দারুব্রহ্মের দর্শনে। উপাসক ছিলেন তিনি গণপতিদেব অর্থাৎ গণেশ ভগবানের। ধারণা ছিল জগন্নাথদেব যখন সর্বসম্প্রদায়ের (সৌর, শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, গাণপত্য) দেবতা, তাঁর মধ্যে নিশ্চয়ই তিনি দর্শন করবেন নিজ আরাধ্যদেব গণপতিকে। শ্রীক্ষেত্রে এক পান্ডার গৃহে তিনি আশ্রয় নিলেন। স্নান পূর্ণিমার পূর্বদিন।

পরদিন স্নানমন্ডপে গিয়ে স্নানপর্ব দেখলেন বটে, কিন্তু দর্শন হল না তাঁর আরাধ্য দেবের। ক্ষেভে, দুঃখে কট্টর গণেশ ভক্ত গণপতি ভট্ট মন্দির প্রাঙ্গণ ত্যাগ করে চলে এলেন আশ্রয় গৃহে। কক্ষের দ্বার বন্ধ করে আক্ষেপের অগ্নিতে দগ্ধ হচ্ছিলেন তিনি। ভাবছিলেন পন্ডশ্রমের কথা।

হঠাৎ দ্বারে মৃদু কারাঘাত কয়েকবার। সচকিত হয়ে উঠলেন গণপতি ভট্ট। বিরক্ত অবস্থায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও খুলে দিলেন দ্বার। দেখলেন সামনে দাঁড়িয়ে সদ্যস্নাত এক ব্রাহ্মণ। শরীর জুড়ে অপরূপ লাবণ্য। বিশাল আয়ত দুই চোখে করুণা ও প্রেমের পরশ। ব্রাহ্মণ তাঁকে প্রায় বিস্মিত করে বললেন — নিরাশ হয়ো না বিপ্র। আজ বৈকালে দর্শন হবে তোমার আরাধ্য দেবের। এইটুকু বলেই ত্বরিতপদে প্রস্থান করলেন ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণ বাক্যে বিশ্বাস রেখে গণপতি স্নানমন্ডপে আসা মাত্রই চক্ষুস্থির। মন্ডপে বিরাজমান তাঁর আরাধ্যদেব একদন্ত, মহাকায়, গজানন গণেশ। গদগদ কণ্ঠে তিনি নিবেদন করলেন স্বতোৎসারিত বন্দনা গণেশরূপী জগন্নাথের চরণে।

বাস্তবে ভক্তবাঞ্ছাপূরণে জগন্নাথদেব এইরূপ গ্রহণ করেন। সেই থেকে স্নানযাত্রার দিন তাঁর হয় গণেশ বা গজানন বেশ।

পরশুরাম জনক জমদগ্নি

নন্দলাল ভট্টাচার্য

পুত্র তাঁর বিষ্ণুর অবতার। মহাধনুর্ধর পরশুরাম। তবুও তাঁকে লাঞ্ছিত হতে হল মাহিষ্মতীর রাজা কার্তবীর্যার্জুনের হাতে। অসহায় পিতা জমদগ্নি প্রতি মুহূর্তে পীড়িত হতে থাকেন এক তীব্র আত্মগ্লানিতে। বারবার মনে হয় তাঁর, তাহলে কী মুখ রইল ব্রহ্মতেজের ? অমন বীর পুত্রের জনক হয়েই বা কী পেলেন তিনি ? এভাবে লাঞ্ছিত হওয়া তো মৃত্যুরই সামিল। তাহলে কি তিনি জীবিত থেকেই মৃত হলেন।

আশ্রমে তখন জমদগ্নি একা। পরশুরাম গেছেন দূরে সমিধ ও ফলমূল আহরণে। জমদগ্নি পুত্রের কথা, নিজের অপমানের কথা ভেবে উদাস হয়ে বসে থাকেন। কিন্তু পরেই পরশুরাম ফেরেন আশ্রমে। বাবাকে অমন বিধবস্ত, উন্মনা হয়ে বসে থাকতে দেখে উদ্বিগ্ন হন পরশুরাম। বলেন, কী, কী হয়েছে বাবা ? তুমি এমনভাবে বসে রয়েছো কেন ?

ছেলের কথায় ঋষি জমদগ্নি প্রায় কেঁদে ফেলেন। ভগ্নকণ্ঠে বলেন, তোমরা থাকতেও আজ আমি নিদারুণ অপমানিত হয়েছি। মিথ্যা মনে হচ্ছে নিজের ব্রাহ্মণত্ব, নিজের তপস্যাকে।

কেন, কী হয়েছে? কার হাতে অপমানিত হয়েছো ? বল, এখুনিই প্রতিকার করছি তার।

অপমান করেছেন রাজা কার্তবীর্যার্জুন।

কেন, কীভাবে অপমান করেছেন ?

শোনো তাহলে। রাজা কার্তবীর্যার্জুন বের হয়েছিলেন সেদিন মৃগয়ায়। সঙ্গে ছিল বহু সৈন্য, পুত্র, পাত্র, মিত্র, বয়স্য। একসময় ক্লান্ত রাজা আসেন আমাদের আশ্রমে। রাজাকে স্বাগত জানিয়ে আমি সকলকেই আশ্রমে আনতে বলি। আমার কথা মতো সকলকে আশ্রমে নিয়ে আসেন রাজা। আমিও তাদের পরিতৃপ্ত করি সুস্বাদু নানা আহারে। তৃপ্ত রাজা জানতে চান, প্রায় মুহূর্তের মধ্যে এতলোকের আহারের ব্যবস্থা করলাম কীভাবে ? উত্তরে জানাই এসবই সম্ভব হয়েছে আশ্রম ধেনু কপিলা বা সুশীলার জন্য।

আমার মুখে সব শুনে লোভে চকচক করে উঠল রাজার দুটি চোখ। তিনি বললেন, ওই ধেনুটি আমার চাই। বিনিময়ে অর্ধেক রাজত্ব, চাই কি আরও বহু স্বর্ণ রত্ন দিতে প্রস্তুত আছি। দয়া করে ওই ধেনুটা আমাকে দিন।

রাজি হলাম না। রাজা তাঁর সৈন্যদের দিয়ে জোর করে সুশীলাকে ছিনিয়ে নিতে

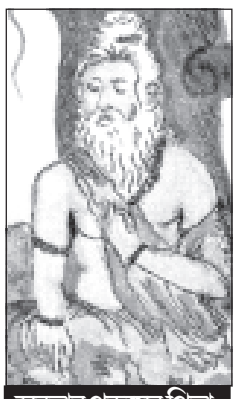

অবতার পুরুষের পিতা

চেষ্টা করেন। বাধ্য হয়েই আমি সুশীলাকে বলি, মা তুমি নিজেই নিজেকে রক্ষা করো। আর তখনই সুশীলার দেহ থেকে অসংখ্য সেনা বেরিয়ে রাজাকে পর্যুদস্ত করে। পরাজিত রাজা যাওয়ার সময় হুমকি দিয়ে গেছেন, এর প্রতিশোধ তিনি নেবেন। এখন কী হবে বাবা রাম ?

চিন্তা করো না বাবা, আমি উচিত শিক্ষা দিয়ে আসছি ওই দুষ্ট পরস্বাপহারক রাজাকে।

বাবাকে প্রণাম করে বেরিয়ে যান পরশুরাম। প্রবল যুদ্ধে কার্তবীর্যার্জুনকে পরাজিত ও নিহত করে ফিরে আসেন তিনি। পুত্রের সাফল্যে খুশি ঋষি, অজস্র আশীর্বাদ করেন তাকে।

এই আনন্দ কিন্তু বেশিদিন রইল না। পরশুরামের অনুপস্থিতিতে কার্তবীর্যার্জুনের ছেলেরা এসে জমদগ্নিকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করে। আর তাতেই প্রচণ্ড ক্রোধে প্রজ্বলিত আগ্নেয়গিরির মতো পরশুরাম একবার, দুবার নয়, একুশবার পৃথিবীকে করেন ক্ষত্রিয় শূন্য।

অবতার পুরুষের বাবা ঋষি জমদগ্নির এই ধরনের শোচনীয় মৃত্যু সহজেই নাড়া দেয় মনকে। প্রশ্ন ওঠে, কেন এমন হল ? ঋষি হয়েও কেন তিনি নিহত হলেন এমনভাবে ? উত্তরে বলা যায়, প্রাক্তন বা কর্মফলকে এড়াতে পারে না কেউই। তাছাড়া ব্রাহ্মণ, ঋষি হয়েও তিনি ক্রোধকে জয় করতে পারেননি। বারবার হার মেনেছেন ক্রোধের কাছে। ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হয়েই তিনি পুত্রদের আদেশ করেছিলেন তাদের মা রেণুকাকে হত্যা করতে। পরশুরামের বড় চার ভাই পিতার এই ভয়ানক আদেশ পালন করেনি। এতে ক্রুদ্ধ ঋষি তাদেরও করেন অভিশপ্ত। ক্রোধকে জয় করতে না পারার কারণেই জমদগ্নিকে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছিল। তাঁর মৃত্যু শিক্ষা দেয়, ক্রোধ হল মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু। এই শত্রুকে বশে রাখতে না পারলে দিতে হয় চরম মূল্য।

ভৃগুবংশজাত বৈদিক ঋষি জমদগ্নির জন্মকেঘিরে রয়েছে একটি অলৌকিক কাহিনী। পিতা তাঁর ঋষি ঋচীক। মা সত্যবতী হলেন রাজা গাধির মেয়ে। দীর্ঘদিন রাজা গাধি এবং সত্যবতীর কোনও ছেলে না হওয়ায় সত্যবতীর অনুরোধেই ঋচীক তাঁদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন চরু তৈরি করে তা খেতে বলেন। কিন্তু ভুল বোঝাবুঝির ফলে সত্যবতীর মা খান সত্যবতীর জন্য রাখা ব্রহ্মতেজ যুক্ত চরু আর সত্যবতী খান মায়ের জন্য রাখা ক্ষত্রিয় তেজ যুক্ত চরু। ব্যাপারটা জানতে পেরে ঋচীক বলেন, এর ফলে সত্যবতী হবেন ক্ষত্রিয় ধর্মাচারী পুত্রের মা, আর গাধির হবে ব্রহ্মতেজ যুক্ত ছেলে।

সত্যবতী স্বামীকে বলেন, তিনি ক্ষত্রিয় তেজযুক্ত ছেলে চান না। ঋচীক বলেন, বেশ, পুত্র তোমার ক্ষত্রিয় হবে না। পরিবর্তে তোমার পৌত্র হবে ক্ষত্রিয়াচারী। রাজি হন সত্যবতী। তার কারণেই জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম হন বীর — ক্ষত্রিয়ের মতোই জেদী ও ক্রোধী। আর ব্রহ্মতেজে গাধির পুত্র হন বিশ্বামিত্র।

এইভাবে চরু বদলের মধ্যেও অবশ্য রয়েছে ভগবান বিষ্ণুর এক লীলা। বিষ্ণু কথা দিয়েছিলেন পৃথিবীকে, ক্ষত্রিয়দের অত্যাচারে জর্জরিত পৃথিবীকে উদ্ধারের জন্য তিনি নিজে আবির্ভূত হবেন অবতাররূপে। সেই কথা রাখতেই তিনি পরশুরামরূপে আবির্ভূত হয়ে পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্য করে আবার তাকে পাপমুক্ত করেন।

সেই অবতার পুরুষ পরশুরামের পিতা জমদগ্নি ছিলেন বেদবিদ। সমস্ত ধনুর্বেদ প্রকাশিত হয়েছিল তার সামনে। তিনি ছিলেন তপস্বী। দীর্ঘ তপস্যার পর তীর্থযাত্রায় বের হন তিনি। সেই ভ্রমণকালেই হাজির হন ইক্ষ্বাকুরাজ প্রসেনজিতের প্রাসাদে। সেখানে তাঁর মেয়ে রেণুকাকে দেখে মুগ্ধ হন জমদগ্নি। বিয়ে করেন তাঁকে। হয় পাঁচটি ছেলে। ছোট পরশুরাম।

জমদগ্নি তপস্বী। জমদগ্নি বেদবিদ। ধনুর্বেদ তাঁর অধিপতি। মহাশক্তিধর তাপস তিনি। তপস্যার বলেই পরশুরামের কুঠারে নিহত রেণুকাকে তিনি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন জীবন।

বোধকথা

সফলতা

আজ তিনি অনেকের কাছেই আদর্শ। জায়গা করে নিয়েছেন বড়দের পাঠ্য পুস্তকেও। তাঁকে দেখার জন্য অনেকে ব্যাকুলও হয়ে পড়েন। অনেকেই পরখ করতে চান ভদ্রলোকের মধ্যে কী আছে। তিনি কী আমাদের মতো মানুষ, না অন্য কিছু। পাঞ্জাবের রাজিন্দর গুপ্ত নিজেই নিজের কাছে এক দৃষ্টান্ত। জীবন সংগ্রামে যে দাঁড়ানো যায় — বড় হওয়া যায় তা তিনি তার জীবন দিয়ে আর পাঁচজনকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। সমাজের সামনেও এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন রাজিন্দর। সুতো তৈরির রাজত্বে তিনি নিজেকে সফল সদাগর হিসাবে তুলে ধরেছেন। এসবই সম্ভব হয়েছে নিজের সাধনায়

টেক্সটাইলের রাজত্বে সত্যিই তিনি সফল। জীবনের শুরুতে কম কষ্ট করতে হয়নি তাঁকে। মাত্র ৩০ টাকা রোজগারে কোনওমতে সংসার টেনেছেন। নিজের হাতে মোমবাতি তৈরি করে সংসার চালাতে হয়েছে তাঁকে। নিজেই মোমবাতি তৈরি করে বিক্রি করেছেন।

একটু বেশি রোজগারের দিকে তাকিয়ে সিমেন্টের পাইপ তৈরির কাজও ধরলেন। কিন্তু তাতেও বিশেষ কিছু সুবিধা হল না। রোজগার যা বাড়ল, তা যথেষ্ট নয়। রাজিন্দর আর একটু বেশি কিছু করার ভাবনা শুরু করল। কিন্তু সে অর্থ রাজিন্দরের ছিল না। তবুও এদিক-সেদিক থেকে বড় ব্যবসার জন্য মনঃস্থির করলেন তিনি। সরকারের লাইসেন্স নিয়ে চালু করলেন সার তৈরির কারখানা।

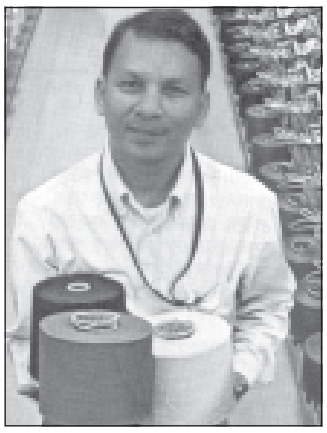

রাজিন্দর গুপ্ত

সারের ব্যবসায় লোকসান হল না তার। প্রথম প্রথম গতানুগতিক চললেও, কিছু দিনের মধ্যেই ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি হতে দেখা গেল। রাজিন্দর এতেই থেমে থাকলেন না। চালু করলেন সুতো তৈরির ব্যবসা। ব্যবসার শুরুতে অনেকেই নিষেধ করেছিল। কেউ কেউ বলেছিল ওতে লাভ নেই। রাজিন্দর তাতে দ্বিধা বোধ করেননি। নিজের সিদ্ধান্তে অবিচল থেকেছেন তিনি। কালক্ষেপ না করে শুরু করেছিলেন সুতো তৈরির ব্যবসা।

কম টাকা নিয়ে নামলেও, তাতে বন্ধ হয়নি ব্যবসা। কর্মীও নিয়োগ করলেন অনেক। দিন-রাত এক করে সুতো তৈরির দিকেই নজর দিলেন তিনি। কম সময়ের মধ্যেই সুতো উৎপাদনে তার নাম-যশ বৃদ্ধি পেতে লাগল। ব্যবসার শুরুতেই নজর কাড়লেন খোদ রাজ্য সরকারের। সরকার তার সঙ্গে যৌথ ব্যবসায় রাজি হয়। তার পর থেকেই 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী।' সাফল্যের প্রথম সোপান সেই মোমবাতিই। তারপর একটার পর একটা ব্যবসায় ধীরে ধীরে অগ্রসর। কখনও থেমে যাননি রাজিন্দর। আজ তারই ব্যবসায় শত শত যুবক-যুবতীর অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। গড়ে উঠেছে এক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। রাজিন্দর গুপ্ত তাঁর ব্যবসায়িক সাফল্যের গুণে জায়গা করে নিয়েছেন পাঞ্জাবের বাণিজ্য স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে।

রাজিন্দরের সেই সুতো কোম্পানীর নাম এখন ভারতজুড়ে—ট্রাইডেন্ট গ্রুপ।

চিত্রকথা ।। অমর শহীদ মহান বিপ্লবী বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কে ।। ৭

বিচিত্র খবর বিচিত্র গল্প

।। নির্মল কর ।।

হ্যামিশ হ্যামিলটন লন্ডনের নামী প্রকাশক ছাড়াও ছিলেন দুর্দমনীয় ক্রীড়া-প্রেমিক। বক্সিং-এ যেমন নাক ভেঙেছে, রোয়িং-এ তেমনি অলিম্পিক রৌপ্যপদক জিতেছেন, খাট পেরিয়ে টেনিস খেলেছেন নিয়মিত। শুধু তাই? একটি এক ইঞ্জিন প্লেন কিনে সারা বৃটেনের আকাশ চষে বেড়াতেন। একদিন এক মাঠে হুমড়ি খেয়ে পড়ে বিমানটি চুরমার হয়ে যায়। পরদিন এক কাগজে ঘটা করে এই মানুষটির প্রয়াণের খবর বেরোল। বেলার দিকে হ্যামিলটন সশরীরে ওই পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলার সমন নিয়ে হাজির। অমন ভয়াবহ দুর্ঘটনায় চালক বেঁচে যেতে পারেন কল্পনাও করতে পারেননি পত্রিকার রিপোর্টার। হ্যামিলটন মামলা করে ওই কাগজের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আদায় করেছিলেন ৩ হাজার পাউন্ড।

✱ ✱ ✱

বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জে ১৩৫ বছরের ঐতিহ্যমন্ডিত 'বউমেলা' সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। তিন দিনের এই মেলায় কেবল বাড়ির বউয়েরা দোকান খুলতে, ব্যবসা করতে পারেন। পুরুষরা শুধু কেনাকাটায় আসতে পারেন। বিক্রি হয় শুধু বাড়িতে এবং গ্রামে তৈরি জিনিসপত্র খাবার-দাবার, হাতে বোনা তৈজসপত্র। কোনও আধুনিক জিনিসের প্রবেশ নিষেধ। বগুড়ার জয়পুরহাটেও মার্চ-এপ্রিলে 'বউ-শাশুড়ি মেলা' বসে। এবছর এই প্রাচীন মেলার বয়স হল ১২৫। এই মেলার বৈশিষ্ট্য বউমেলার মতো।

✱ ✱ ✱

বহু দেশের নামকরণের পেছনে একটা ছোট-খাটো ইতিহাস থাকে। লন্ডন আমেরিকার বেলাতেও তা রয়েছে। এক সময় ইংল্যান্ডের বর্বর অধিবাসীরা তাদের দেশকে 'লানডান' নামে অভিহিত করত। তারপর রোমানরা যখন ইংল্যান্ড জয় করে সেখানে বসবাস করতে শুরু করল, তখন তারা এর নাম রাখল 'লন্ডিনিয়াম'। পরবর্তীকালে ভাষার কিছু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই নাম লন্ডন নামে পরিচিত হল।

✱ ✱ ✱

রাজনীতিতে বিশেষভাবে পরিচিত 'ধর্না' শব্দটির প্রথম সন্ধান পাওয়া যায় 'রামায়ণ'-এ। রামকে অযোধ্যায় ফেরাতে চিত্রকূটে রামের কুটিরের সামনে ভরত হত্যে বা ধর্না দিয়েছিলেন। শর্ত ছিল রাম অযোধ্যায় ফিরে যেতে রাজি না হলে ভরত তাঁর ধর্না তুলে নেবেন না।

✱ ✱ ✱

উড়োজাহাজের ককপিট থেকে বান্ধবীর দিকে বিয়ের প্রস্তাব ঘোষিত হল মাইক্রোফোনে। প্রস্তাব দিয়েছিলেন ৩৩ বর্ষীয় কো-পাইলট। কোপেনহেগেন থেকে অসলোয় উড়ছে বিমান। সাতাশ বছরের বান্ধবী, বিমানসেবিকা চুলছিলেন। হঠাৎ এই ঘোষণায় চমকে ওঠেন। পরে সম্মতি জানান ককপিটে গিয়ে এবং বিমানযাত্রীদের হর্ষধ্বনির মধ্যে শর্ত ছিল একটাই, আকাশে নয়, বিয়েটা হবে মাটিতে

র/ঙ্গ/কৌ/তু/ক

শিক্ষক ঃ বল তো লোহা খোলা জায়গায় রাখলে কিছুদিন পর তাতে মরচে ধরে যায়। সোনা এভাবে রাখলে কী হবে?

ছাত্র ঃ চুরি হয়ে যাবে, স্যার।

✪ ✪ ✪

মালিক ঃ সবাই একসঙ্গে দু'টি করে বস্তা বইছে, তুমি কেন একটা বইছ?

মজুর ঃ বাবু, ওরা অলস তো, তাই দু'বার হাঁটার ভয়ে একসঙ্গে দুটো বস্তা বইছে।

✪ ✪ ✪

দিদিমণি ঃ এখন যে তারাটি তোমাদের দেখাব, তার আলো পৃথিবীতে পৌঁছতে ৪ ঘন্টা সময় লাগে।

তানিয়া ঃ কিন্তু অতক্ষণ এখানে বসে থাকলে মা খুব চিন্তা করবেন, দিদিমণি!

✪ ✪ ✪

চাকর ঃ বাবু, কাল রাতে স্বপ্ন দেখলুম, আপনি খুশি হয়ে আমাকে ৫০ টাকা দিয়েছেন।

মালিক ঃ ঠিক আছে, সামনে মাসের মাইনে থেকে ওই ৫০ টাকা কেটে নেব।

✪ ✪ ✪

ডাক্তার ঃ আপনার স্ত্রীর দেহের মেদ কমাতে যে রোলারটা ব্যবহার করতে দিয়েছিলাম, তা দিয়ে কোনও উপকার পেলেন?

স্বামী ঃ হ্যাঁ ডাক্তারবাবু, রোলারটা অনেকটা ক্ষয়ে গেছে।

—নীলাদ্রি

মগজচর্চা

১। কার অভিনীত নাটকের অনুষ্ঠান লিপিতে লেখা থাকত : অনুগ্রহপূর্বক করতালি দিবেন না?

২। আদিতে কোন্ দেশে কফি 'অ্যারাবিয়ান ওয়াইন' নামে পরিচিত ছিল?

৩। 'অন্নদামঙ্গল' রচয়িতা মধ্যযুগের কবি ভারতচন্দ্রকে 'রায়গুণাকর' উপাধি দিয়েছিলেন কে?

৪। আজ পর্যন্ত ক্রিকেটে এক ইনিংসে কে বেশি সময় ধরে ব্যাট করেছেন?

৫। উইলিয়াম কেরি কি কি ভাষায় অভিধান রচনা করেন?

৬। কোন্ সম্রাটের প্রিয় ঘোড়ার নাম ব্যাসেকেলাস?

—নীলাদ্রি

উত্তরঃ

(১) রবীন্দ্রনাথের

(২) ইউরোপে

(৩) মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র

(৪) হানিফ মহম্মদ (পাকিস্তান)

(৫) সংস্কৃত, বাংলা, মারাঠি ও তেলেগু

(৬) গ্রীক বীর আলেকজান্ডারের

নেপালে রাজনৈতিক পরিস্থিতির দ্রুত বদল ঘটছে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। নেপালের প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে প্রচণ্ডর ইস্তফার পর, নেপালের নতুন প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন মাধব কুমার নেপাল। প্রেসিডেন্ট রামবরণ যাদবের সঙ্গে

নেপালের নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী মাধব কুমার নেপাল।

সংঘাতের জেরে প্রচণ্ডর সরে যাওয়ার পর নেপালবাসীর দায়ভার এখন মাধব কুমারের হাতে। সি পি এন-এর (ইউ এম এল-র) প্রাক্তন সচিব মাধব কুমার ২২টি দলের সমর্থনে প্রধানমন্ত্রী পদে বসেছেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, মাধব কুমার মসনদে বসলেও, মাওবাদী সমস্যা থেকে নেপাল এখনও মুক্ত নয়। মাধব কুমার নির্বাচিত হবার আগে পর্যন্ত নেপালে মাওবাদী সমর্থকরা বিভিন্ন সমস্যা তৈরির গোপন ষড়যন্ত্র চালিয়েছিল। এমনকী প্রচণ্ডকেই প্রধানমন্ত্রী পদে আবার বসানোর দাবিও জানিয়েছিল। যদিও পরিস্থিতি সেদিকে মোড় নেয়নি। প্রচণ্ডকে হারিয়ে শেষ হাসি হেসেছেন মাধব কুমারই।

ওয়াকিবহাল মহলের মতে, মাওবাদী প্রচণ্ডর প্রকাশ করা সিডি-ই খোদ মাওবাদীদের মধ্যে ফাটল ধরিয়েছে। গরীবের কাছে যারা প্রকৃত বন্ধু হিসাবে নিজেদের জাহির করেছে, তাদের মধ্যেই বিভেদ তৈরি হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছে। আয়ত্তে আনতে পারেননি প্রচণ্ডও। নেপালের মানুষও মাওবাদীদের থেকে দূরে সরে দাঁড়িয়েছে। প্রচণ্ডর সিডি তাতে আগুনে ঘি জুগিয়েছে। ওই সিডিতে প্রচণ্ড নিজেই জানিয়েছেন, মাওবাদী লড়াকুদের আসল সংখ্যা থেকে তারা ৫ গুণ বেশি সংখ্যা প্রচার করেছেন। এবং তাদের সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত করার প্রয়াসও চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

ওই সিডি শুধু মাওবাদীদের মধ্যেই নয়, সাধারণ মানুষের মনকেও ধাক্কা দিয়েছে। এই মিথ্যাচারের জন্য নেপালবাসী মনেপ্রাণে প্রচণ্ডর পরিবর্তন চেয়েছে। এই সংকটের মুখে প্রচণ্ডর ভারত বিরোধী মন্তব্য পরিস্থিতি আরও জটিল করে তোলে। দেশবাসীর উদ্দেশ্য প্রচারিত ভাষণে (টিভিতে) তিনি ভারতের নাম উহ্য রেখে বলেন, বিদেশী শক্তিগুলি চাইছে আমরা অর্থাৎ নেপাল যাতে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে না পারে। প্রচণ্ড এখানেই থামেননি। তিনি সরকারের বাইরে থেকেও এই শক্তির বিরুদ্ধে লড়ার কথা জানিয়েছেন। তাঁর আর এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও ভারত বিরোধিতায় ইন্ধন জুগিয়ে যাচ্ছেন। প্রচণ্ডর আমলের অর্থমন্ত্রী ডঃ বাবুরাম ভট্টরাই সরাসরি ভারত বিরোধী মন্তব্য করেন। তিনি প্রকাশ্যে বলেন, ভারত আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছে। কিন্তু দেশবাসীর স্বার্থে আমরা তা বরদাস্ত করব না। মাওবাদী নেতা প্রচণ্ডর শুরু থেকেই ভারত বিরোধী মনোভাবের পরিচয় ফুটে উঠেছে। মসনদে বসার সঙ্গে সঙ্গেই চীনের দিকে ঝুঁকেছিলেন তিনি। সখ্যতা বৃদ্ধি র চেষ্টা করছিলেন।

নেপালের রাজনীতি পালাবদল ঘটলে, নতুন প্রধানমন্ত্রী ভারত ভ্রমণ দিয়েই তাঁর বিদেশ ভ্রমণ শুরু করবেন। মোটামুটি এটাই হল নেপালের বিদেশ নীতির অঙ্গ। কিন্তু প্রচণ্ড শুরু থেকেই মনেপ্রাণে চীনের প্রতি দরদী। তিনি প্রথমেই চীন ভ্রমণ করেন। তাঁর চীন যাত্রার পর থেকেই চীনের সেনা ও প্রশাসনিক স্তরের বহু কর্মকর্তার নেপালে আনাগোণা শুরু হয়। তাঁরা চীনের পক্ষ থেকে প্রচণ্ডকে সর্বতোভাবে সাহায্যের আশ্বাসও দিয়েছিলেন। দুই কমিউনিস্ট শাসনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। অপরদিকে ঘণীভূত হচ্ছিল ভারতবিদ্বেষও।

চীনে আশ্রয় নেওয়া নেপালীদের ওপর চীন সরকারের দরদও তখন বেড়ে গিয়েছিল। এমনকী নেপাল-ভারত সীমান্তে চীনকে ভারত বিরোধী কাজেও মদত জুগিয়েছিল প্রচণ্ড সরকার। পরবর্তী চীন যাত্রায় প্রচণ্ড চীনের সঙ্গে ভারতবিরোধী ষড়যন্ত্রের এক বড় ধরনের ব্যবস্থা করে আসতেন বলেই মনে করছেন কূটনীতিবিদরা। যদিও সে সম্ভাবনার সমূলে বিনাশ হয়েছে। মাধব কুমারের হাতেই নেপালের দায়ভার অর্পিত হয়েছে।

বিশেষজ্ঞ মহলের মতে, প্রচণ্ডর মাওবাদী আদর্শ সর্বনাশ ডেকে আনত নেপালের জন্য। চীনের প্রতি অতিদরদ পরোক্ষে নেপালেরই সর্বনাশ করত। চীন তার ফয়দাও তুলত। নেপালের জনগণ তা বুঝে গিয়েছিল। মাধব কুমারের নির্বাচন, রাজনৈতিক দলগুলিরও সেই পূর্বাভাসেরই পরিচয় দেয়। নেপাল পার্লামেন্টের দ্বিতীয় বৃহত্তম দল নেপালী কংগ্রেসও প্রচণ্ডর এই নীতিতে ক্ষুব্ধ ছিল। মাধব কুমারকে সমর্থন করে তারা প্রচণ্ডকে উপযুক্ত জবাব দিয়েছে।

মাধব কুমারের নেতৃত্বাধীন সরকারের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরাও। রাষ্ট্রপতি রামবরণ যাদব যদি প্রচণ্ডর কথামতো সেনাপ্রধান জেনারেল রুকমঙ্গদ কাটওয়ালকে বরখাস্ত করে দিতেন, তাহলে হয়ত প্রচণ্ড এত বড় ধাক্কা খেতেন না। মাওবাদীদের স্বপ্নও এভাবে চুরমার হত না। নেপালী কংগ্রেস, মধেশী জন অধিকার ফোরাম, সদ্ভাবনা পার্টি প্রমুখ দল মাধব কুমারের নেতৃত্বে প্রচণ্ডর শক্তি খর্ব করেছে।

প্রচণ্ডর শক্তি একেবারে কিন্তু দমে যায়নি। গত ২৩ মে কাঠমাণ্ডুতে মাওবাদীরা বড় সমাবেশ করে তাদের শক্তি প্রদর্শন করেছে। এছাড়া বিরোধী রূপে প্রচণ্ড ও তাঁর দলের পক্ষে বিভিন্ন সমস্যা তৈরি করাও আশ্চর্যের কিছু নয়। ভারতের পক্ষে নেওয়া ইতিবাচক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জনগণকে তারা বিভ্রান্তও করতে পারে। এমনকী সরকারি সিদ্ধান্তের অবমাননা করাও তাদের পক্ষে আশ্চর্য কিছু নয়। ইতিমধ্যে প্রচণ্ড অভিযোগ করেছেন, নেপালে আবার রাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে ভারত ষড়যন্ত্র করছে। অন্যদিকে মাধব কুমারের নীতির ওপর ভারতের যথেষ্ট ভরসা রয়েছে। ভারত সরকারও সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে। ফলে নেপালের পরবর্তী পদক্ষেপ সব দিক থেকেই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

শোকসংবাদ

ভারতীয় জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গ শাখার অন্যতম সাধারণ সম্পাদক রাহুল সিনহা-র মাতৃদেবী গৌরী সিন্‌হা গত ২৩ মে পরলোক গমন করেছে। তিনি দুই পুত্র, পুত্রবধূ ও নাতিদের রেখে গেছেন।

🕯 🕯 🕯

স্বস্তিকা-র বিজ্ঞাপন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মী দীপক গঙ্গোপাধ্যায়ের পিতৃদেব নির্মল গঙ্গোপাধ্যায় গত ৩১ মে-র ব্রাহ্মমুহূর্তে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বৎসর। বেশ কিছুদিন ধরে তিনি অসুস্থ ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক পুত্র ও এক কন্যা এবং বহু গুণমুগ্ধ বন্ধু রেখে গেছেন।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বেলঘরিয়া শাখার স্বয়ংসেবক ছিলেন তিনি। দৃঢ় ও নির্লোভ চরিত্রের জন্য ছিলেন সকলের প্রিয়পাত্র।

ইসলামপুর এখন গরু পাচারের ঘাঁটি

মহাবীর প্রসাদ টোডি।। ইসলামপুর মহকুমায় প্রতি মাসে গবাদি পশু নিয়ে কোটি কোটি টাকার চোরাকারবার চলছে। পুলিশ ও কাস্টমস্ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই কারবার নিয়ন্ত্রণ করছে আন্তঃরাজ্য ও আন্তর্জাতিক মাফিয়ারা। মহকুমার বেশ কিছু প্রভাবশালী ব্যবসায়ী এই কারবারে টাকাও খাটাচ্ছে। আর প্রশাসনের বিভিন্ন মহলে তাদের ব্যাপক প্রভাব থাকায় এই কারবার বন্ধ করা যাচ্ছে না। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, কাস্টমস্ ও পুলিশ নিষ্ক্রিয় থাকায় পাচারকারীদের কাজকর্ম ক্রমশ বেড়েই চলেছে।

কাস্টমস্ সূত্রে জানা গেছে, ইসলামপুর মহকুমার সোনাপুরহাট, পাঞ্জিপাড়া, ডালখোলা ও পূর্ণিয়ামোড় এখন গরু ও মহিষ পাচারের ঘাঁটি হয়ে উঠেছে। বিহার ও হরিয়ানার বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রতিদিন ট্রাকে করে গবাদি পশু এনে ওই এলাকাগুলিতে জড়ো করা হয়। তারপর সেখান থেকে ট্রাকে করে বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। কাস্টমস্-এর এক কর্তা বলেন, রোজ বিকেল তিনটে থেকে রাত দুটো পর্যন্ত গবাদি পশু নিয়ে গড়ে প্রায় ৬৫টি ট্রাক বিভিন্ন সীমান্তে যাচ্ছে। সেখান থেকে সুযোগ মতো বাংলাদেশে পাচার করা হচ্ছে।

সম্প্রতি প্রায় প্রতি রাতে রায়গঞ্জ থেকে পাঞ্জিপাড়া পর্যন্ত জাতীয় সড়কে ঘুরে দেখা গেল, বিভিন্ন ট্রাকে পা বেঁধে গবাদি পশু পাচার করা হচ্ছে। টহলদারীতে ব্যস্ত পুলিশ ও কাস্টমসের কর্মীরা ট্রাকগুলিকে দাঁড় করিয়েও ছেড়ে দিচ্ছে। যদিও কাস্টমস্ সূত্রেই জানা গেছে, 'প্রোটেকশন টু পেট অ্যানিম্যাল অ্যাক্ট' অনুসারে গবাদি পশু যানবাহনে নিয়ে যাওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ।

এদিকে ইসলামপুরের এস ডি পি ও ডেভিড লেপচা নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, সীমিত ফোর্স নিয়ে অভিযান চালানো সম্ভব নয়। ইতিপূর্বে বহুবার আমরা গবাদি পশু সমেত ট্রাক আটক করেছি। তবে আইনের মারপ্যাঁচে দুষ্কৃতীরা জামিন পেয়ে যায়। তবুও নজরদারি বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে।

বই বাজারে প্রকৃত ক্রেতার ভীড়

বিশ্ব বই বাজার-২০০৯। ছবি - দীপেন ভাদুড়ী

।। দীপেন ভাদুড়ী।।

প্রশ্ন করে জানলাম অচিন্ত্য বোস এসেছেন বর্ধমান থেকে। বেশ কিছু বই কিনে বিগশপারে নিয়ে যাচ্ছেন। হাওড়া থেকে ট্রেন ধরার তাগিদ। প্রশ্ন করলাম, বর্ধমান বইমেলা অথবা কলকাতা বই মেলায় বই কিনেছেন? "হ্যাঁ, তা অবশ্য সামান্য কিছু কিনেছি। তবে এই বাজার থেকে বেশি কিনি, কারণ এখানে ছাড় অনেক বেশি পাওয়া যায়।" ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে উঠলেন বাস ধরার জন্য। ক্ষমা চেয়ে আবার প্রশ্ন করলাম, "এ বইগুলো শুধু আপনি পড়েন? না—

আমাকে থামিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, "আমি, আমার স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে, মা সবাই আমরা বইয়ের পোকা।" বলে দৌড়ে বাসে উঠে গেলেন।

মনটা প্রশান্তিতে ভরে উঠল। আজ বই বাজারে প্রবেশের সময় একজন পাঠকের সঙ্গে পরিচয় হল। যাঁর পরিবারের সকলে এখনও মুদ্রিত বইয়ের একনিষ্ঠ পাঠক।

গতকাল একজনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল এই বই বাজারে। নাম জানানো চলবে না। এই শর্তে জানালেন "আমার অত সময় নেই বই পড়ার। নেহাৎ গিন্নি দুপুরে ঘুম তাড়ানোর জন্য বই পড়ে। তাই ৫০ এবং ৬০ শতাংশ ছাড়ে চারটে বই কিনে নিয়ে যাচ্ছি। প্রশ্ন করলাম, কলকাতা বইমেলায় বই কিনেছিলেন?

ভদ্রলোক উত্তর দিয়েছিলেন, "রাম ঃ বইমেলায় মাত্র ১০ ভাগ ছাড়। ওখানে কেউ কেনে? অবশ্য গিয়েছিলাম, খাওয়া দাওয়া করে বাড়ি ফিরেছিলাম।

পাবলিশার্স এ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ড এবং পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি যৌথভাবে ২৩ এপ্রিল থেকে ১ মে '০৯ নন্দন চত্বরে 'বিশ্ব বই বাজার" এর আয়োজন করেছিল। সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার। পাঠকদের উৎসাহের অভাব নেই। যদিও "কলকাতা বুক ফেয়ার' এর মতো ভীড় হচ্ছে না। তবুও পুস্তক ব্যবসায়ীরা খুশি এ ধরনের বাজারে। এখানে প্রায় সকলেই কিছু না কিছু বই কিনছেন। তাদের অভিমত এ বাজারে প্রকৃত ক্রেতাই আসেন। কয়েকজন পাবলিশার জানালেন, গতবারের চাইতে এবার তাঁদের বিক্রি বেশি হচ্ছে। তাঁরা এবার শতকরা ২০ ভাগ থেকে ৪০ ভাগ ছাড় দিচ্ছেন। কিছু প্রকাশক ১০ টাকা, ২০ টাকার লটেও বই বিক্রী করছেন। আবার অনেক ৫০ / ৬০ ভাগ ছাড় দিচ্ছেন।

প্রতিদিন মুক্তমঞ্চে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান হচ্ছে। বেশ জমে গিয়েছিল "লিটল ম্যাগাজিন কতটা লিটল", "বই এবং সাহিত্য" এবং "জন্ম শতবর্ষে সুবোধ ঘোষ" আলোচনা সভা।

এ বছর পঞ্চাশ-এর বেশি পুস্তক প্রকাশক এই বাজারে অংশগ্রহণ করেছে। এম সি সরকার এ্যান্ড সন্স, Eastern Book House, দেজ পাবলিশিং, এশিয়া পাবলিশিং, আনন্দ পাবলিশার্স, দেব সাহিত্য কুটির, National Book Trust, মিত্র ও ঘোষ, উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, শৈব্যা প্রকাশন, তুলি কলম প্রভৃতি।

এই প্রতিবেদক অনেক ক্রেতার সঙ্গে আলোচনা করে জানলেন তাদের আগ্রহ ফিরে আসছে মুদ্রিত বই পাঠে। তবে বেশির ভাগ পাঠক পছন্দ করেন গল্প, গোয়েন্দা কাহিনী, কল্পবিজ্ঞানের বইগুলি। কিছু পাঠক খুঁজে বেড়াচ্ছেন নামকরা দুষ্প্রাপ্য কিছু বই। কবিতার বই-এর পাঠক প্রায় নেই বললেই চলে। অবশ্য পাঠকেরা চাইছেন মুদ্রিত বই-এর চাহিদা বাড়ুক এবং এই শিল্পে জড়িত পরিবারগুলোর মুখে হাসি ফুটে উঠুক।

বই কিনতে কিনতে চপ, কাটলেট, আইসক্রিম, পপকর্ন, চা, পান খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। আর রয়েছে নন্দন চত্বরের পুরনো খাবারের স্টলগুলো। অবশ্য খাওয়ার স্টলগুলোয় ভীড় জমে উঠেছে।

শ্রীঅরবিন্দ মিউজিক কলেজের উদ্যোগে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির মঞ্চে অনুষ্ঠিত (১০.০৫.০৯) 'মহানির্বাণ' নৃত্যনাট্যের একটি দৃশ্য।

শব্দরূপ - ৫১১

অনিমা পোদ্দার

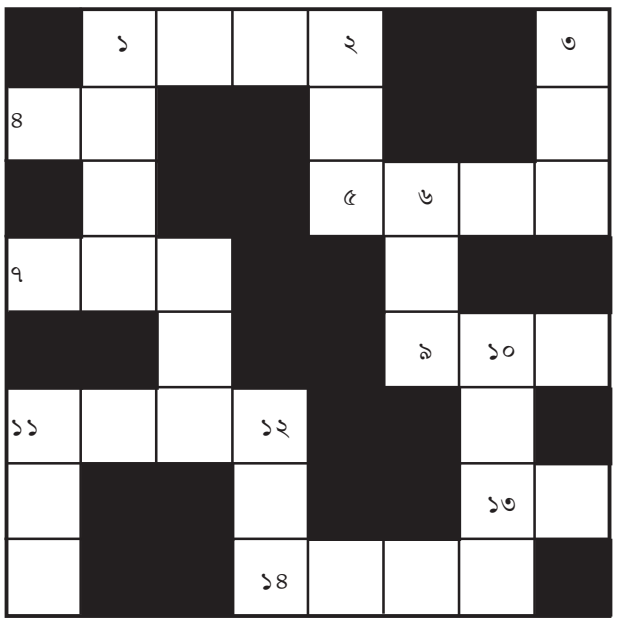

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ১. বৌদ্ধ সন্ন্যাসী সম্প্রদায় বিশেষ, মধ্যে প্রতিজ্ঞা, ৪. তৎসম শব্দে লজ্জা, শেষ ঘরে চরণ, ৫. বিশেষণে ছয়টি পা যুক্ত, মধ্যে ইঙ্গ শব্দে খুব ভালো, ৭.কুরুবংশধর, ৯. রত্ন-র কোমল ও কথ্য রূপ, ১১. বিশেষণে অভীষ্ট পূর্ণ হয়েছে এমন, শেষ দুয়ে কাজ, ১৩. গঙ্গার আট পুত্র, গণদেবতা বিশেষ, ১৪. বাল্মীকির পূর্ব নাম।

উপর-নীচ ঃ ১. প্রথম দুয়ে তৎসম রাত্রি, শেষ দুয়ে খাজনা, আসলে চাঁদ-এর অন্য নাম, দুয়ে ঠ্যাং, ২. পাপ, মালিন্য, ৩. বৈশেষিক দর্শন প্রণেতা মুনিবিশেষ, প্রথম দুয়ে সূক্ষ্ম অংশ, ৬. ধনুকের ছিলার শব্দ, ৮. তৎসম শব্দে প্রদীপের সলতে, আগাগোড়া তিরস্কার, ১০. প্রতিশব্দে বনস্পতি, বৃক্ষ শ্রেষ্ঠ, ১১. বুদ্ধ দেব বিশেষণে সফলকাম। ১২. দেবালয়, উপাসনাগৃহ।

সমাধান শব্দরূপ ৫০৯

সঠিক উত্তরদাতা

শান্তনু গুড়িয়া
বাগনান, হাওড়া।
শৌণক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৭

■	প্র	■	■	■	যা	ম	ল
■	মা	ন	স	■	জ	■	ক্ষ্ম
স	■	■		ত	ক্ষ	■	ণ
ন	চি	কে	তা	■	■	■	ভ
কা	■	■	■	ম	হে	শ্ব	র
বে	■	শ	রী	রী	■	■	ত
হু	■	ক	■	চি	রা	গ	■
লা	ঙ	ল	■	■	■	জ	■

● এই সংখ্যার সমাধান আগামী ২২ জুন ২০০৯ সংখ্যায়।

পশ্চিমবঙ্গের শনি.....

বিদ্যাধর ভট্টাচার্য।। পশ্চিমবঙ্গে এখন শনির দশা চলছে। কারণ স্বয়ং শনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে অধিষ্ঠিত। হর্তা কর্তা বিধাতা তিনি। গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল। কাকে বলেছেন দেখে নেবো, কাকে বলেছেন মাথা ভেঙে দেবো। লোকসভা ভোটে জনগণ যখন ব্যালটের মাধ্যমে তাদের হাত পা মাথা সব ভেঙে নুলো করে দিল, তখন তিনি ফেগলু হয়ে বিনয়ের অবতার সেজে পদত্যাগের নাটক করছেন। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ভেবেছিল এবার পশ্চিমবঙ্গে শনির দশা কাটতে চলছে, কিন্তু

বিক্ষোভের মুখে মুখ্যমন্ত্রী।

এখন তা কাটলো না। বহু নাটক করে পশ্চিমবঙ্গের শনি স্বস্থানেই রয়ে গেলেন। স্বেচ্ছায় যাবেন না। সিঙ্গুরে শিল্প আর নয়াচরে কেমিক্যাল হাব গড়ার জন্য অপেক্ষা করবেন এখনও। বাংলার মানুষ শনির দশার অবসান চেয়ে যে দ্ব্যর্থহীন রায় দিয়েছেন তারপরেও বিপ্লবী কবির বাংলা অনার্স পড়া ভ্রাতুষ্পুত্রের পদত্যাগের নাটক করে যাওয়া মানায়?

চোরেদের মন্ত্রিসভায় থাকা যায় না বলে যিনি সাধুবেশে মন্ত্রিসভা ছেড়েছিলেন, এমন বেনজির অবস্থার পর তিনি হার্মাদদের নেতা ও পুঁজিপতিদের দালাল হয়ে গদি আঁকড়ে থাকবেন কেন? এটা তো গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চরমতম অপমান। কেননা লোকসভার এই রায় জানিয়ে দিয়েছে— সিঙ্গুর থেকে ন্যানো বিদায় নেওয়ার মতো তাঁরও এবার যাবার দিন ঘনিয়ে এসেছে। টাটা এবং ন্যানোর বিদায়ে বাংলা শুদ্ধ হয়েছে, এবার তাঁরও যাবার দিন আসন্ন। এমন অসভ্যদের সভ্য সমাজে থাকাই উচিত নয়। সমাজের আবর্জনা তাই পরিস্কার করেছে মানুষ।

আগামী দিনের কথা চিন্তা করে স্বয়ং টাটা মমতার পায়ে প্রণামী দিতে চেয়ে কয়েক লক্ষ টাকার চেক পাঠিয়েছেন। এতদিন ধরে তিনি বৃথাই শনি মন্দিরে টাকা ঢেলেছেন। রাজ্যে লাল বেহাল হওয়ায় তিনি সবুজে মজেছেন। রসে বশে প্রাচুর্য্যে যাদের তিনি চোখের মণি করে রাখতে চেয়েছিলেন, তারা এখন বাংলার মানুষের কাছে চোখের বালিতে রূপান্তরিত। তাই এখন লোভের ফাঁদ পেতে দল বদল করতে চেষ্টা চালাচ্ছেন টাটা। বামফ্রন্টকে টা টা করে দল বদল ধীরে ধীরে আরও অনেকেই করবেন। যিনি নিজেই ফেগলু তার ঘরে কে থাকে? পূর্ব মেদিনীপুরের কিরণ্ময় নন্দ ঘর ছাড়তে তৈরি। কারণ, আগামী ভোটেই তাঁর মুগবেড়িয়া কেন্দ্রটি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এবার তাঁকে জিততে গেলে অধিকারীদের পদবন্দনা করতেই হবে। অন্য শরিকরা এখন 'শনি-রাহু-কেতু' এই ত্রয়ীকে হঠাতে শলাপরামর্শে ব্যস্ত। কিন্তু শনি-রাহু-কেতু আজ পুঁজিবাদের সেবায় ব্যস্ত। তারা কেউ পদ ছাড়তে রাজি নয়। লোকসভা নির্বাচনে বিপর্যয়ের অভিনব ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে স্বয়ং রাহুর উক্তি থেকে। টাকা বিলিয়ে এবার ভোট কিনেছে বিরোধীরা। কারণ রাহুর দলের পুরুষ কমরেডরা তখন হিজড়ে সেজে সুন্দরবনে নাচতে গিয়েছিল, আর মহিলা কমরেডরা তো পাছা দেখাতে দেখাতে ক্লান্ত। ক্লান্ত না হলে এতবড় ঝড় 'আয়লা' পাছায় ধাক্কা লেগে ফিরে যেত। কিন্তু রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট, আর আয়লার আক্রমণে মানুষ বিপর্যস্ত। রাজাবাবু কেষ্ট সেজে সঙ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। দুর্গত মানুষকে রক্ষা করার মুরোদ নেই তাঁর। হতভাগা কোম্পানীর ম্যানেজার তিনি। ভাত দেবার মুরোদ নেই, কেবল জ্ঞান দেবার মাস্টার। কিন্তু এখন তাঁর জ্ঞান কে শুনবে? দলের ভিতরে এবং বাইরে গভীর সঙ্কটে তিনি দিশাহারা। পরাজয়ে মানুষ শিক্ষা নেয় কিন্তু দু' কান কাটা নির্লজ্জরা কি শিক্ষা নেবে? কয়লা ধুয়ে পরিস্কার করলেই কি ফরসা হয়। তাই প্রথম প্রথম লজ্জায় দু-তিন দিন বিনয়ের অবতার সাজলেও, আবার স্বরূপ প্রকাশ হচ্ছে ধীরে ধীরে। যার যা স্বভাব তা ঢাকা থাকবে কোন ওষুধে। শাক দিয়ে কি মাছ ঢাকা যায়। তাই শনির দশা বাঙালির এখনও কাটছে না, ২০১১ পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে। এখন শনি দুর্বল হয়েছে মাত্র। কিন্তু অশুভ গ্রহ দুর্বল হলেও ক্ষতি করতে সক্ষম। ২০১১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে এই শনি-রাহু-কেতুদের বিদায় না করলে, বাংলার ভাগ্যাকাশে আয়লার থেকেও বড় বিপর্যয় ঘটতে বাধ্য।

কাজ ফুরোতেই ভরদ্বাজকে সরিয়ে দিলেন সোনিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। অনেক আশায় অপেক্ষা করে করেও শেষ পর্যন্ত ডাক পেলেন না হংসরাজ ভরদ্বাজ। বিগত মন্ত্রিসভায় তিনি আইনমন্ত্রী ছিলেন। অনেকবারই নিজের মান-সম্মানের তোয়াক্কা না করেই গান্ধী পরিবারের সেবা করে গিয়েছেন। পঞ্চ দশ লোকসভার নির্বাচন চলাকালীন তিনিই বোফর্স কামান কেনার ঘুষ মামলায় সি বি আই তদন্ত বন্ধ করে দেন বলে অভিযোগ। এর ফলে সোনিয়া-গান্ধী পরিবারের ঘনিষ্ঠ মিত্র ইতালির ওত্তাভিও কোয়াত্রোচ্চি তার সীজ করা অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা-পয়সা লেন-দেন করার সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে যান।

সাড়ে চার বছর সমর্থনের পরে গত বছর যখন বামপন্থীরা ভারত-আমেরিকা অসামরিক পরমাণু চুক্তির বিরোধিতা করে মনমোহন মন্ত্রিসভা থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে এবং বিজেপি-র সঙ্গে একযোগে আস্থা ভোটের বিপক্ষে ভোট দেন, তখন মনমোহন সরকারকে বাঁচাতে এই ভরদ্বাজই মুলায়ম সিং-এর সঙ্গে দৌত্যের কাজ করেছিলেন। স্পেশাল স্টিং অপারেশনে সমাজবাদী পার্টীর সাধারণ সম্পাদক অমর সিং-এর সঙ্গে তার ওই একান্ত বৈঠক ধরা পড়ে গিয়েছিল।

বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, '৯৩ মুম্বাই বিস্ফোরণ মামলায় জড়িত সঞ্জয় দত্তের বিরুদ্ধে চালু মামলার বিষয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়েছিল। সারা দেশের মানুষ কিছুদিনের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করে যে, মুলায়ম -অমর জুটি কোমর কষে সরকারকে সংসদে বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং সঞ্জয় দত্ত অভিনেতা থেকে নেতা বনে গিয়ে মুলায়মের দলে যোগ দেন। লক্ষ্ণৌ থেকে ভোটে লড়ার ইচ্ছা থাকলেও তাতে বাদ সাধে সুপ্রীম কোর্ট। তখন সঞ্জয় দত্তকে মুলায়ম তার দলের সম্পাদক করে নেন। সঞ্জয়ও সমাজবাদী পার্টির হয়ে সস্ত্রীক রোড শো করে নির্বাচনী প্রচারে নামেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দাউদ

হংসরাজ ভরদ্বাজ

কোম্পানীর পরিকল্পিত ১৯৯৩ মুম্বাই বিস্ফোরণে ৪৮০ জন নিরীহ মানুষ মারা গিয়েছিলেন।

ভরদ্বাজ আইনমন্ত্রী থাকাকালীন সমাজবাদী পার্টি সুপ্রীমো মুলায়মের আয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিহীন সম্পত্তি মামলায় সি বি আই সুপ্রীম কোর্টে মুভ করেছিল। সেসময় মুলায়মের সঙ্গে কংগ্রেস এর সম্পর্ক ছিল সাপে-নেউলে। পরে মনমোহন সরকারকে সমর্থনের সুবাদে মুলায়ম-এর বিরুদ্ধে কেন্দ্রের লীগাল অফিসারের আবেদন প্রত্যাহার করা হয়।

সব মিলিয়ে অনেকবারই হংসরাজ কেন্দ্র সরকার এবং গান্ধী পরিবারকে সঙ্কটে পার করে দিয়েছেন। এবার ক্যাবিনেটে ডাক না পাওয়ায় তাই টি ভি চ্যানেলে মুখ খুলেছেন। তাঁর বক্তব্য — "আমি আশা করেছিলাম ক্যাবিনেটে আমার জায়গা হবে। আমি তো মনে করি, মন্ত্রী হিসেবে কাজ ভালোই করেছি। তবে এই সিদ্ধান্ত (মন্ত্রী না করা), আমাকে পিঠে ছুরি মারার সামিল। আমাকে রাজীবজী নিয়ে এসেছিলেন, সেজন্য আমি কোনও তিক্ত কথা বলতে চাই না।"

মন্ত্রী না হওয়ায় ভরদ্বাজ দুঃখ পেলেও গান্ধী পরিবারের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস কালচারে অবশ্য এটা নতুন কিছু নয়। এই পরিবারের ঐতিহ্যই হল প্রয়োজনে ব্যবহার এবং পরে ছুঁড়ে ফেলা অথবা বেশি বাড়তে না দেওয়া। ইন্দিরা ঘনিষ্ঠ প্রণব মুখার্জীকে ১৯৮৪-তেই রাজীব বহিষ্কার করে দেন। অনেক পরে দলে ফেরান যোজনা কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান করে।

যশপাল কাপুর, আর কে ধাওয়ানদের কপালেও একই ব্যবহার জুটেছে। সর্বশেষ উদাহরণ হল, টাইটলার ও সজ্জন কুমার। এমন কী যে মমতাকে নিয়ে তাদের আপ্যায়নের আদিখ্যেতা চলছে সেই মমতাকে যখন সিপিএম বাহিনী সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে সরাসরি আক্রমণ করেছিল, তখনও কোনও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, নেতা-নেত্রীকে দেখা যায়নি। এবারেও নিজেদের জয় নিয়ে সন্দিহান রাহুল-সোনিয়া-প্রণবরা ফলাফল প্রকাশের আগে আগবাড়িয়ে বামপন্থীদের সমর্থন চেয়ে গেছেন বারবার। আর প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং পরমাণু চুক্তিতে থাপ্পড় খাওয়ার পরেও বলেছেন, বামেদের সঙ্গে নিয়ে সরকার চালাতে তার কোনও অসুবিধা হয়নি, ভবিষ্যতেও হবে না।

বিস্মরণের পর্দা সরিয়ে আলোয় এল পাঞ্জাবের শেষ মহারাণী

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। জনসমক্ষে উঠে এল পাঞ্জাবের শেষ মহারাণী জিন্দ কাউরের অজানা ইতিহাস। পাঞ্জাবের এই শেষ মহারাণীর ইতিহাস অনেকেরই অজানা। জানা নেই কীভাবে তিনি সাহসিকতার সঙ্গে বৃটিশ শাসকদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। কালের প্রবাহে তাঁর ইতিহাস তুলে ধরার কোনও উদ্যোগ এতদিন চোখে পড়েনি। সম্প্রতি বৃটিশ ঐতিহাসিকদের উদ্যোগে সেই অভাব অনেকটাই মিটেছে। 'মহারাজা দলীপ সিং' নামে বইটিতেই প্রথম তুলে ধরা হয়েছে মহারাণীর রাজত্বের বিভিন্ন দিক। বইটি রাজার আত্মজীবনী হিসাবে প্রকাশ পেলেও, সমস্ত বিষয়ই ইতিহাস আশ্রিত। ইতিহাস সম্বলিত বইটির প্রকাশক কোরেন্ট পাবলিশিং লিমিটেড। বৃটিশ ঐতিহাসিক পিটার বেনস-র উদ্যোগেই বইটি রচনা ও প্রকাশ সম্ভবপর হয়েছে। যদিও একাধিক ঐতিহাসিকের তথ্য ও লেখা এই বইয়ে স্থান পেয়েছে। মহারাজা রণজিৎ সিং-এর মৃত্যুর পর মহারাণীকেই দায়িত্ব নিতে হয় রাজত্বের। সালটা ১৮৩৯। বৃটিশ সাম্রাজ্য তখন মধ্যগগনে। পুত্র দলীপ সিং-এর বয়স কম। গত্যন্তরে জিন্দ কাউরই হলেন রাণী। বৃটিশরা তাঁর রাজত্বের শুরু থেকেই তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে লাগলেন। মহারাণীও এর আঁচ পেয়ে তাঁর শক্তি আরও সংগঠিত করতে লাগলেন। কিন্তু তা বৃটিশদের কাছে খুবই সামান্য। ফলে অচিরেই বৃটিশরা হামলা (১৮৪৯) করে দখল নিল পাঞ্জাবের। বৃটিশ শাসকরা মহারাণীকে কারারুদ্ধ করল। পুত্রকেও সরিয়ে রাখা হল তাঁর কাছ থেকে। এক ডাক্তারের পালিত পুত্ররূপে ইংল্যাণ্ডে দলীপ বড় হতে লাগল।

বৃটিশরা মহারাণীকে কারারুদ্ধ করেই ক্ষান্ত হল না, শুরু করল মহারাণীর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা। অবশেষে তিনি ক্রীতদাসীর ছদ্মবেশে জেল থেকে পালিয়ে যান। একসময় পায়ে হেঁটে ৮০০ মাইল পার হয়ে নেপালে চলে যান রাণী। যেখানে এক আশ্রমে তিনি আশ্রয় নেন। শিখদের কাছে তিনি এখনও স্মরণীয়। তাঁর অনেক কথাই উঠে এসেছে এই বইয়ে। যার মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে পাঞ্জাবের বহু ঐতিহাসিক তথ্যও। ১৩ বছর পর তাঁকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল তাঁর সন্তানকে দেখার। দলীপ সিং-ই পরবর্তীতে পাঞ্জাবের দায়িত্ব নেন। ঐতিহাসিকদের মতে দলীপ সিং তাঁর মা'র দেখানো পথ ও মা'র দেওয়া শিক্ষার জোরেই সফল হয়েছিলেন — পতনের মুখ থেকে ঘুরে দাঁড়াতে পেরেছিলেন। তাঁর শেষ জীবন কেটেছিল প্যারিসে। গোটা পরিবারের কাহিনী অবশ্য সেদিক থেকে যথেষ্ট বিয়োগান্তক। বইটি ঐতিহাসিক মহলে সাড়া ফেলবে বলেই অনেকে মনে করেছেন।

Swastika
8 June - 2009, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registered No. SSRM/Kol. RMS/W.B./RNP - 048/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
L.No. MM&P.O. - SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-021/2007-09

বড়বাজার কুমারসভা-র বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী স্মৃতি ব্যাখ্যানমালা

বীরসাভারকর আন্দামানে নৌ-ঘাঁটি স্থাপনের স্বপ্ন দেখেছিলেন

ভাষণরত ডঃ হরীন্দ্র শ্রীবাস্তব।

বাসুদেব পাল ।। স্বাতন্ত্র্যবীর সাভারকর ছিলেন প্রখর দূরদৃষ্টি সম্পন্ন রাজনৈতিক নেতা, সুবক্তা, সুপণ্ডিত এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে জ্বলন্ত লাভা উদ্‌গীরণকারী আগ্নেয়গিরির সমান।' এই মন্তব্য 'সাভারকর' বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ডঃ হরীন্দ্র শ্রীবাস্তব-এর। গত ৩১ মে কলকাতার মহাজাতি সদনে (অ্যানেক্স) বড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে তিনি ওই কথা বলেন। কুমারসভা পুস্তকালয় সাভারকরের ১২৫ তম জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে আচার্য বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী স্মৃতি ব্যাখ্যানমালার (চতুর্থ) আয়োজন করে। এবারকার ব্যাখ্যানমালার শীর্ষক ছিল 'স্বাতন্ত্র্যবীর সাভারকর ঃ এক বিরল যোদ্ধা'।

প্রকৃতপক্ষে এদিন প্রধান বক্তা, প্রধান অতিথি, সভাপতি থেকে শুরু করে সভা পরিচালনকারী — প্রত্যেকের কথাতেই উঠে আসছিল সাভারকরজীর জীবনের বিরল থেকে বিরলতম বিভিন্ন দিক। এখানে উল্লেখ্য, প্রধান বক্তা ডঃ হরীন্দ্র শ্রীবাস্তব দেশে-বিদেশে সাভারকর-এর অবস্থানের স্থানগুলিতে বার বার গিয়েছেন। সাভারকরের জীবনী নিয়ে একটি প্রামাণ্য ডকুমেন্টারি ছবি তৈরি করে দূরদর্শনে জমা দিয়েছেন। যদিও রাজনৈতিক কারণে তা আর প্রচারের আলো দেখেনি।

ডঃ শ্রীবাস্তব প্রথমেই উল্লেখ করেন সাভারকরের জনমোহিনী প্রতিভার কথা। ২৭ ডিসেম্বর ১৯৩৯ সালে বীর সাভারকর হিন্দু মহাসভার ২১ তম বার্ষিক অধিবেশনে যোগ দিতে কলকাতায় এসেছিলেন। তিনি হাওড়া স্টেশনে পৌঁছালে তাঁকে অভ্যর্থনা ও স্বাগত জানাতে এত বেশি সংখ্যায় ভিড় হয় যে, স্টেশন থেকে বের হতেই প্রায় সত্তর মিনিট সময় লাগে। সেদিন তিনি হিন্দু মহাসভার বিশিষ্ট নেতা ব্যারিস্টার এন সি চ্যাটার্জির বাড়িতে বিশ্রাম নেন। পরদিন সভার সভাপতি হিসেবে তাঁর সংবর্ধনা সভায় তিন ঘণ্টাব্যাপী লিখিত ৭০ পাতার ভাষণ পাঠ করেন। সেই ভাষণ শুনতে লক্ষাধিক জনতা উপস্থিত হয়েছিল — একথা পরদিন ইংরেজ অনুগত বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়।

হরীন্দ্রজী বলেন, তিনি যে গবেষণা বা তথ্যচিত্রের কাজে দেশে-বিদেশে গিয়েছেন তাতে তাঁর কোনও কৃতিত্ব নেই। সাভারকরজীর প্রতিভা ও জীবনের এতটাই প্রভাব যে তিনি তা করতে বাধ্য হয়েছেন।

সাভারকরের দূরদৃষ্টি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দ্বীপান্তর বা কালাপানির সাজা ভোগ করতে তাঁকে জাহাজে ১৯১১-এর ২ জুলাই আন্দামানের সেলুলার জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। তখনই তিনি স্বগতোক্তি করেন —এখানে যদি ভারতীয় নৌবাহিনীর ঘাঁটি হয়। তাঁর সেই স্বপ্ন কার্যকারণ সাপেক্ষে বাস্তবায়িত হয় ৫০ বছর পর ১ জুলাই ১৯৬১-তে। সাভারকর-এর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল — 'সেনায়েঁ সজগ হো, সীমায়েঁ সুরক্ষিত হো, হাতিয়ার নবীনতম হো।' অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে শ্রী শ্রীবাস্তব বলেন, সম্প্রতি জলপথে অসুরক্ষিত এলাকা দিয়েই কয়েকজন সশস্ত্র জঙ্গি ভারতে ঢুকে প্রায় তিনদিন ভারতের সেনাদের কীভাবে নাস্তানাবুদ করেছে তা সবাই প্রত্যক্ষ করেছেন। এক্ষেত্রে সাভারকরের সঙ্গে শিবাজী মহারাজের সাযুজ্যও তিনি তুলে ধরেন। শিবাজী ৩০টি

(বাঁ দিক থেকে) মহাবীর বাজাজ, প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠি, হরীন্দ্রজী, তরুণ বিজয়, সুধাকররাও, কেশব দীক্ষিত এবং যুগরকিশোর জৈথলিয়া।

বন্দরে নৌ-সেনার ঘাঁটি নির্মাণ করেছিলেন। জীবনের শেষ সময়ে উপবাসে বিনা উপচারে সাভারকরজী আত্মত্যাগ করেন। তখনও তাঁর অন্তরে দেশভাগের তীব্র বেদনা। বেদনার্ত অন্তরে তিনি বলেছিলেন, লাহোর, রাওয়ালপিন্ডি, সিন্ধু ফিরিয়ে দিলে তিনি আবারও উঠে দাঁড়াবেন। অখণ্ড ভারতের প্রতি সাভারকরজীর অন্তরের টান এতটাই গভীর ছিল।

সভার প্রধান অতিথি ডঃ সুধাকর রাও ভালেরাও এসেছিলেন নাগপুর থেকে। তিনি বলেন, সাভারকর ছিলেন একাধারে উগ্র দেশ প্রেমিক রাজনীতিক এবং সমাজ সংস্কারক। রত্নাগিরি দুর্গে বন্দী অবস্থায়ও তিনি সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্ণের সকলকে সঙ্গে নিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর নীতি ছিল — হিন্দুদের সামরিকীকরণ এবং রাজনীতির হিন্দুত্বকরণ। ডঃ ভালেরাও সীতারাম ইয়েচুরির বক্তব্য খণ্ডন করে বলেন, সাভারকর নিজের মুক্তির জন্য কখনই ইংরেজ শাসককে পত্র লেখেননি। সেই পত্র জাতীয় মহাফেজখানার ২০৪৫ নং ফাইলের ৭ নং পৃষ্ঠায় রয়েছে। সেই পত্রে ১৯১৪ সালের নভেম্বরে তিনি নিজেকে বাদ দিয়ে অন্যদের মুক্তি চেয়েছিলেন। কারণ, সাভারকরের একান্ত ইচ্ছা ছিল হিন্দু যুবকরা সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে বন্দুক চালাতে শিখুক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে লোকমান্য তিলকও একই কথা বলেছিলেন। আর সময়মতো বন্দুকের নল ঘোরানোর প্রকৃষ্ট উদাহরণ আজাদ হিন্দ ফৌজ-ই তো দেখিয়েছে। ডঃ ভালেরাও সাভারকরের লেখা যখন যা পান তাই পড়ে ফেলতে সকলকে অনুরোধ জানান।

সভার সভাপতি বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং দিল্লীর শ্যামাপ্রসাদ ফাউণ্ডেশনের সভাপতি তরুণ বিজয় বলেন, যতদিন না ঢাকেশ্বরী মন্দির মুক্ত হচ্ছে, লাহোর, রাওয়ালপিন্ডি মুক্ত হচ্ছে ততদিন সাভারকরের কাজ ও স্বপ্ন অসম্পূর্ণ। বিশ্বব্যাপী হিন্দুত্বের গৈরিক পতাকা উড্ডীন হলেই তা সম্ভব। সেজন্যই সকলকে কাজ করে যেতে হবে। স্বাধীন ভারতের (১৯৪৭-র পর)১ লক্ষ ২৫ হাজার বর্গ কিলোমিটার ভূমি চীন ও পাকিস্তান দখল করে রেখেছে। কোনও দলই বলে না ওই জমি ফেরৎ আনবো, আমাদের ভোট দিন। এদিন সাভারকর বিষয়ে বিভিন্ন লেখকের লেখা প্রবন্ধ এবং সাভারকরজীর নিজের লেখা সম্বলিত এক মূল্যবান স্মরণিকার আবরণ উন্মোচন করেন তরুণ বিজয়। সাভারকরকে নিয়ে অনুপম কবিতার সঙ্কলন গ্রন্থের লোকার্পণ করেন ডঃ হরীন্দ্র শ্রীবাস্তব। সভার শুরুতে বিষয় উপস্থাপন করেন প্রবীণ সমাজসেবী যুগল কিশোর জৈথেলিয়া। সভা পরিচালনা করেন মহাবীর বাজাজ। সভার শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অরুণ প্রকাশ মল্লাবত।

শ্রীচৈতন্যর সন্ন্যাসের ৫০০ বর্ষ পূর্তি

বিশাল সংকীর্তন যাত্রার প্রস্তুতি

(বাঁ দিক থেকে) বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী, ভদ্রচারু দাস, অশোকানন্দ, সিংহানিয়াজী এবং ডঃ প্রীতিমাধব রায়। ছবি ঃ স্বপন কুমার পাল

সংবাদদাতা ।। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব আজ এ দেশে কেবল নয়, সারা বিশ্বে বন্দনীয় মহাপুরুষ। সনাতন শাস্ত্র স্বীকৃত কৃষ্ণাবতার রূপে পূজিত। তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণ পরহিতে — জীব উদ্ধারে। প্রেমধর্মের সংজ্ঞা সঠিকভাবে জনমানসে পৌঁছে দিতে। যে গোপী প্রেমকে সাধারণ মানুষ নিন্দিত বলে ভাবতেন, তাকে তিনি উপস্থাপিত করলেন আলোক সামান্য গরিমায়। সেদিন বিদ্বৎ সমাজ সঠিকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন গোপীপ্রেম তথা রাগানুরাগ ভক্তির প্রকৃত ব্যাখ্যা। সন্ন্যাস জীবনে মহাপ্রভু যে প্রজ্ঞা ও বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন, তা আজ সমস্ত সাধু সমাজের কাছে বরণীয় ও অনুসরণীয় হয়ে আছে। মাত্র প্রেম বিতরণের মাধ্যমে তিনি হিন্দু সমাজ তো বটেই, অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়ের কাছে বরণীয় ও গ্রহণীয় হয়ে উঠেছিলেন। মহাপ্রভুর এই আদর্শকে সামনে রেখে সমস্ত সাধু সম্প্রদায় এক জোট হয়ে আগামী ২০১০ সালের ১৯ জানুয়ারি তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণ স্থান কাটোয়া থেকে পুরী (ওড়িশা) পর্যন্ত এক মহতী সংকীর্তন যাত্রার আয়োজন করতে চলেছি।

মহাপ্রভু যে পথে পুরীধামে গেছিলেন, সঙ্কীর্তন যাত্রা যাবে সেই পথরেখা ধরে। ১৭ দিন ব্যাপী।

কথাগুলি জানালেন ইস্‌কনের মায়াপুরস্থ আন্তর্জাতিক প্রধান কেন্দ্রের বরিষ্ঠ আধিকারিক শ্রী ভদ্রচারুদাস। গত ২৩ মে কলকাতার (এলবার্ট রোড) ইস্‌কন মন্দিরে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে। উদ্যোক্তা ছিলেন সাধু-সম্প্রদায় ও সাধারণ ভক্তবৃন্দের যৌথ মঞ্চ 'মহাপ্রভু প্রবর্তিত হরিনাম প্রচার সমিতি''। উল্লেখ্য উক্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা হয় মহাপ্রভুর সন্ন্যাস যাত্রা পূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষে। যার মধ্যে আছেন দশনামী, বৈষ্ণব, শাক্ত ইত্যাদি সকল সম্প্রদায়ের সাধুগণ।

ওই সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন স্বামী আশোকানন্দ গিরি, শ্রীমৎ বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী ও প্রীতিমাধব রায়। সম্মেলন পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন কুঞ্জবিহারী সিংহানিয়া।

স্বস্তিকা
শ্যামাপ্রসাদ সংখ্যা

যে সন্ধ্যায় শ্যামাপ্রসাদের মরদেহ কলকাতা বিমানবন্দরে এসে পৌঁছাল তখন যে জনসমুদ্র তাঁর শেষযাত্রায় ছিল, তার তুলনা নেই। দীর্ঘ দমদম রোডের ওপর মাইলখানেক লম্বা জনস্রোত বাংলার শেষ বাঘ শ্যামাপ্রসাদকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিল। আজও সে শ্রদ্ধা অমলিন। কমিউনিস্টদের কুৎসা, সেকুলার মতাবলম্বীদের নানা ভণ্ডামি শ্যামাপ্রসাদকে ব্রাত্য করতে পারেনি। শ্যামাপ্রসাদের আদর্শ ও মতবাদ আজও সকলের প্রয়োজনীয়। এসব নিয়েই বিশিষ্ট লেখকদের তথ্যনিষ্ঠ মননশীল রচনায় সমৃদ্ধ।

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হচ্ছে।। দাম ছয় টাকা।।
আগামী ২৩ জুনের মধ্যে কপি বুক করুন, নতুবা বাড়তি কপি দেওয়া সম্ভব নাও হতে পারে।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, দূরভাষ ঃ ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫, e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com